অগ্নীমহল

আশাপূর্ণা দেবী

ত্রিবেণী প্রকাশন

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ
পৌষ ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা— ১২

মুদ্রাকর
অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৮৮ বি, মদনমোহন বর্মণ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

ব্লক মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিন্টার্স

বাঁধাই
তৈকুর আলী মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

দাম : চার টাকা

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখিকার :

ছাড়পত্র, কনক দীপ, উন্মোচন, নেপথ্য নায়িকা, জনম্ জনম্‌কে সাথী,
অতিক্রান্ত, শশীবাবুর সংসার, আংশিক, নির্জন পৃথিবী, নবজন্ম,
কল্যাণী, যোগ বিয়োগ, অগ্নিপরীক্ষা, বলয়গ্রাস, মিত্তির
বাড়ী, প্রেম ও প্রয়োজন, গল্প পঞ্চাশৎ, সরস
গল্প, স্বপ্ন শর্বরী, পূর্ণ পাত্র, স্বনির্বাচিত গল্প,
আর এক দিন, শ্রেষ্ঠ গল্প, সাগর
শুকায়ে যায়, জল আর
আগুন, চন্দনে
কুঙ্কুমে, (যন্ত্রস্থ)

(ছোটদের)

রাজা নয়, রাণী নয়,
গল্প ভালো আবার বলো,
গল্প হলো শুরু, শোনো শোনো
গল্প শোনো, ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প, বলবার
মতন নয়, ভাগ্যি যুদ্ধু বেধেছিল, রঙিন
মলাট, হাফ্-হলিডে, ছোট্ ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা।

সূচীপত্র

॥ পঙ্খীমহল ॥

'ময়ূরপঙ্খী নাও' নয়, ময়ূরপঙ্খী পালঙ্ক।

নিকষ কালো আবলুস কাঠের গড়নের গায়ে গায়ে, ময়ূর-পেখমের কোনায় কোনায় হাতীর দাঁতের ঝিকিমিকি-কাজ-করা সাবেক পালঙ্ক। পরিকল্পনাটা যেমন চমৎকার, ভঙ্গিটা তেমনি নিখুঁত। যেন পালঙ্ক নয়, সত্যিকার ময়ূর-পঙ্খীই উজোন স্রোত ঠেলে এগবে বুঝি এখুনি।

পঙ্খীর পেটের মধ্যে মাখন-তুলতুলে বিছানা। স্প্রিংয়ের গদি, সাটিনের সুজনি, মখমলের বালিশ, রেশমের ঝালর। পালঙ্কে উঠতে রুপোর কানাত-মোড়া, কারুকার্য-করা পিতলের জলচৌকি। পালঙ্কের মাথার উপর মখমলের ঝালর-ঝোলানো টানা-পাখা।

ঘরটা অভিনব।

সাদা মার্বেলে মোড়া লম্বা হলঘর, তার একেবারে শেষ প্রান্তটা থিয়েটারের স্টেজের ধরনে বেদীর মত উঁচু করে গাঁথা। হাত তিনেক উঁচু, হাত আষ্টেক চওড়া, এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল এই বেদীটার উপরই ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কখানা বসানো। বেদীর দুই কোণে দুটো প্রকাণ্ড বড় পিতলের পিলসুজের উপর পঞ্চপ্রদীপের মত পাঁচবাতির বাতিদান, রঙিন কাচের আচ্ছাদনে ঢাকা। পালঙ্কের মাথার কাছে কাশ্মীরী জালিকাজের একটা ত্রিপদী, তার উপর ইটালিয়ান পোর্সিলেনের ফুলদানি।

এখনও টাটকা ফুলের বাঁধানো তোড়ার নিত্য বরাদ্দ আছে মালী-বউয়ের কাছে।

ঘরের নিচু মেঝে থেকে বেদীতে উঠতে এ-হদ্দ ও-হদ্দ যে গোটা তিন-চার সিঁড়ি সেগুলোও শ্বেতপাথরের, শুধু তাতে কালো পদ্মলতার বর্ডার। আজও অটুট, আজও নিখুঁত। অথচ এ প্রাসাদের বয়েস হিসেব করতে বসলে এ-শতক ডিঙিয়ে ও-শতকের মধ্যসীমায় চোখ ফেলতে হয়।

ব্রিটিশ আমলের অর্থে আর সামর্থ্যে গড়া হলেও মুর্শিদাবাদের কাছঘেঁষা এ অঞ্চলে তখনও নবাবী পছন্দের বোলবোলাও। পয়সা হাতে এলেই

'আশ মিটিয়ে নবাবি করে নেব' এই ছিল লোকের চরম বাসনা। কলকাতার চিত্তে তখন হঠাৎ আলোর ঝলকানি এসে লাগলেও, অন্যান্য অঞ্চল ঘুমন্ত।

এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম পয়সাটা করে গিয়েছিলেন মাত্র, বোল-বোলাওটা তাঁর ছেলে সাধনরামের। তার পর থেকে তিন-চার পুরুষ ধরে চলছে ঐশ্বর্যের আর বনেদিয়ানার রোমন্থন।

পৃথিবী যে এগচ্ছে, ঘেরাটোপ-ঘেরা পালকি থেকে বেরিয়ে পড়ে পৃথিবী যে আকাশে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সে বার্তা যেন এখানে পৌঁছেও পৌঁছয় নি। এখানের দিনরাত্রি আজও আবর্তিত হচ্ছে—নবাবী আমলের জের আর পুরনো ব্রিটিশ আমলের জোয়ারের স্মৃতির ধোঁয়ায় পাক খেয়ে খেয়ে।

দেশে কত ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত ভূমিকম্প হয়ে গেল, এদের যেন চৈতন্য নেই কিছুতেই।

বাইরে—সদর-মহলে নাকি তলে তলে এক আতঙ্কের চাঞ্চল্য উঠেছে, 'জমিদারি লোপ হবে,' 'রাজা খেতাব ধুলোয় মিশবে' এমনি কত কিছু খবরের ঢেউয়ে, কিন্তু অন্তঃপুর এখনও অচঞ্চল। সেখানে এ-খবর অবিশ্বাস্য।

অন্তঃপুরের নিঃশঙ্ক হৃদয় জানে, যেখানে যতই তোলপাড় হোক সেটা এখানে এসে ধাক্কা মারবে না। সকাল বিকেল রুপোর বাটিতে রুপটানটা থাকবে অক্ষয়। জানে, কেশপ্রসাধনে বসে সোনার পাতে মোড়া চিরুনির দাঁড়ায় যদি সহসা একগাছা রুপোলী চুল উঁকি দিয়ে বসে, সেটাই হচ্ছে চরম দুঃসংবাদ।

কিন্তু আজকে যে সরমা এমন নিথর হয়ে বসে ছিলেন 'ময়ূরপঙ্খী ঘরে'র মাঝখানে-পাতা চৌকো পাথরের চৌকিটার ওপর চুল-বাঁধার দাসীটাকে আপাতত তাড়িয়ে দিয়ে, সেটা ওই রুপোলী চুলের মত দুঃসংবাদে নয়।

কিন্তু দুঃসংবাদই কি?

বরং যে দাসী এ বার্তা বহন করে এনেছিল, তাকে নতুন কাঁসার রেকাবিতে করে দশটা টাকা বখশিশ করেছিলেন তো সরমা।

স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন সরমা হয়তো সামনের ছবিখানার দিকেই দৃষ্টি ফেলে। মুখোমুখি দেয়ালে উঁচুতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার একখানি প্রায় পূর্ণাবয়ব তিনরঙা ছবি, চওড়া সোনালী ফ্রেমে গাঁথা। অন্য অন্য দেয়ালে কয়েকটা

বিলিতী নিসর্গদৃশ্য, ওই তিনরঙাই। শুধু সব-কিছুই অনুজ্জ্বল, সব-কিছুর উপরই 'কালে'র একটা ধূসর ছায়াচ্ছন্ন প্রলেপ।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তিনটে দরজা, তার কাঠের গায়ে বড় বড় কাট, তাতে মোটা রেশমী দড়ি বাঁধা যে মখমলের পর্দা ঝোলানো, সেগুলো বিবর্ণ কীটদষ্ট।

সবটা মিলিয়ে যেন গুহার অন্ধকারে ঢাকা মোগল-হারেমের একটা বাসী টুকরো নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে এই 'পক্ষীমহলে'র মধ্যবিন্দুতে।

তবু এই ঘর, এই মহল, ওই তিন হাত উঁচু বেদীর ওপর বসানো অভিনব পালঙ্ক, এই চিরপরিচিত আরাম আয়েস আর বিলাসিতার উপকরণগুলি কী প্রচণ্ড শক্তিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে শোভনরামের স্ত্রী সরমার হৃদয়প্রাঙ্গণে!

'সরমা' নামটা অবশ্য ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে তুলে আনা। একদা ছিলেন 'বউরানী', এখন 'রানীমা'। দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, এখন চল্লিশের কোঠায়। জীবনে কখনও বাপের বাড়ি গিয়ে থাকেন নি, ত্রিশ বছর ধরে এই ঘরের সঙ্গে বাঁধা আছেন সহস্র অভ্যাসের নাগপাশে। ত্রিশ বছরের প্রায় প্রত্যেকটি রাত্রির মিলনতপ্ত সুরভিত শ্বাস বিলীন হয়ে আছে এই পাথরের জালি-কাটা দেয়ালে দেয়ালে, জাফরি-কাটা জানলার গায়ে গায়ে, গৃহসজ্জার রেশমে সাটিনে কাচে পিতলে।

সরমার শাশুড়ী আর দিদিশাশুড়ীর মত ময়ূরপঙ্খী পালঙের মাখন-তুলতুলে শয্যায় কখনও একা রাত কাটাতে হয় নি সরমাকে।

এ বংশে সরমার মত স্বামী-সৌভাগ্যবতী আর-কেউ কখনও ছিল কি না সন্দেহ। শুধু স্বামীভাগ্যই বা কেন, পুত্রভাগ্যও কম নয় সরমার। এক ছেলে একাই এক শো।

চাঁদের মত রূপ, মনের মত গুণ, লেখাপড়ায় নামকরা। যা নাকি এ বংশে একেবারে নতুন আমদানি। তেমনি রূপসী বধূও সংগ্রহ করে এনেছেন সরমা। ছেলের উপযুক্ত।

বনেদী বাড়ির মেয়ে নয়। না হোক, সরমা নিজেও তো এসেছিলেন গৃহস্থ ঘর থেকে। এসেছিলেন গৃহিণীহীন গৃহে, শাশুড়ী ছিলেন না, তবু সেই দশ বছর বয়েস থেকেই গৃহিণীর কর্তব্য আর দায়িত্ব মাথায় করে নিয়েছিলেন। আর গৃহিণীর মর্যাদাও পেয়ে এসেছেন সেই বালিকা-কাল থেকেই।

সরমার পুত্রবধূ এখনও দায়িত্বহীন, এখনও 'নতুন মহলে'র প্রজা হয়েই আছে।

আছে—আজও আছে নতুন মহলের বাসিন্দা হয়ে।

মনে মনে বুঝি একবার কথাটা উচ্চারণই করলেন সরমা। 'আর থাকবে না।'

অদ্ভুত এক নিয়মের নিগড় আজও চাপানো আছে এ বংশের উপর। সেই নিগড়ই আজ জাঁতার মত চেপে ধরেছে সরমার চিত্ত আর চৈতন্যকে। চাপানো আছে! কিন্তু কে চাপিয়ে রেখেছে? কে শাস্তি দেবে সে নিয়ম না মানলে?

স্তব্ধ হয়ে এই কথাই ভাবছিলেন সরমা, ভাবনার শেষে নিশ্বাস ফেললেন, নাঃ, তা হয় না। সরমার সভ্যতা আর মর্যাদাবোধই বাধ্য করবে সরমাকে চিরাচরিত এই নিষ্ঠুর নিয়মটাকে মানতে। মানতেই হবে সে নিয়ম, ছাড়তেই হবে এই 'পক্ষীমহল' আর ময়ূরপঙ্খী পালঙ।

এ বংশের নিয়ম হচ্ছে পৌত্রসন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই রানীকে ত্যাগ করতে হবে এই মহল, এ মহলের উপর অধিকার জন্মাবে নব সন্তানবতীর।

কিন্তু শুধুই কি এই?

এইখানেই কি নিষ্ঠুরতার শেষ?

'পিতামহ' আর 'পিতামহী'র সম্ভ্রমরক্ষার্থে রানীমাকে বাস করতে যেতে হবে তাঁর একক মহলে, আর রাজাবাবুকে 'বারমহলে'। এই নিয়মের নিগড় আজও অমোঘ হয়ে আছে গোবিন্দরামের বংশে। সরমা আজ সেই নিয়মের 'বলি'। 'নতুন মহলে'র দাসী এসে জানিয়ে গেছে সেই চরম দণ্ডের আভাস-বাণী, যে দাসীকে নতুন কাঁসার রেকাবিতে করে নগদ দশটা টাকা বখশিশ দিলেন সরমা।

পাথরের চৌকি থেকে উঠে মখমলের পর্দা ঠেলে পশ্চিমের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন সরমা। বারান্দা বটে কিন্তু বাইরের জগতের হাতছানি কোথাও নেই। চকমিলানো বাড়ি, বারান্দার সামনাসামনি উঠনের ওধারে আর-এক সারি বারান্দা আর ঘর।

তবু পশ্চিমের এই বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই, সরমার মুখে পড়ন্ত বেলার সোনালী আলোর একটা ঝলক এসে লাগল। সরমা নিজেই অনুভব করলেন, করে যেন বিহ্বল হয়ে গেলেন।

চল্লিশ পার হয়-হয় সরমার, তবু এখনও কী অপূর্ব সুষমাভরা লাবণ্যমণ্ডিত

গুই! মুখের গড়নে, চিবুকের তৌলে, ঠোঁটের রেখায় তরুণীর সৌকুমার্য। আঙুলের আগাগুলি এখনও নিখুঁত নিটোল চাঁপার কলির তুলনাবাহী, পা দুখানিতে কচি আমপাতার পেলবতা।

ময়ূরপঙ্খী মহলের মধ্যবিন্দুতে যেমন নিথর হয়ে আছে মধ্যযুগের একটা ভগ্নাংশ, সরমার দেহেও বুঝি তেমনি নিথর হয়ে আছে খানিকটা লাবণ্যের জ্যোৎস্না। এ জ্যোৎস্না যেন বিদায় নেবার কথা ভুলে গেছে। হয়তো বা মনে পড়বার, মনে পড়ে সচেতন হয়ে ওঠবার অবকাশই পায় নি সে।

রাতের পর সকাল এসেছে, দাসী এসেছে রুপোর ডাবরে জল আর সদ্য-মাজা ঝকঝকে পিতলের কানা-তোলা থালায় করে মুখ ধোয়ার সুগন্ধী সরঞ্জাম নিয়ে, তার পর এসেছে ঠাকুরবাড়ি থেকে ফল মিষ্টি ছানা চিনির প্রসাদ। আবার এসেছে দাসী স্নানের নানাবিধ আয়োজন নিয়ে, স্নানান্তে সরমা পরেছেন মিহি সুতীর শাড়ি ব্লাউস, বদলে বদলে পরেছেন সরু হার হালকা চুড়ি। হালকা ঝরঝরে মূর্তিটি নিয়ে রান্নাবাড়ি আর ঠাকুরবাড়ি, অতিথি-মহল আর 'নতুন মহল' পরিদর্শনে গিয়েছেন, তার পর স্বামীর আহারের তদ্বির করতে বসেছেন সিল্কের ঝালর-লাগানো চন্দনকাঠের পাখা নিয়ে। তেমনি পাখা দিয়ে আবার সরমাকেই বাতাস করেছে দাসীরা সরমার আহারের সময়।

বিকেলে আবার রুপোর বাটিতে 'রূপটান', সোনার পাতমোড়া চিরুনি আর হরেক রকম গন্ধবাস, সোনার সিঁদুর-কৌটো আর সোনার টিপ-কৌটোয় কুঙ্কুম নিয়ে দাসী এসেছে ঘণ্টা দুইয়ের মত। শুধু প্রসাধন করিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি সে, প্রশংসা করেছে প্রতিদিন সরমার রেশমী কোমল কেশের 'ঢাল'য়ের, সুগঠিত দেহভঙ্গির, চামড়ার কোমলতার আর রঙের ঔজ্জ্বল্যের। আবার গহনা বদলে নতুন গহনা, আবার ময়ূরপঙ্খী পালঙ্কের কোণে এলিয়ে বসে স্পন্দিত প্রতীক্ষা। বয়স থমকে আছে, থমকে আছে লাবণ্যের জ্যোৎস্না।

'রানীমা'র কর্তব্য পালন হয়েছে—এই 'মৃদুলয় আলাপে'র ছন্দে ছন্দে। গৃহস্থ-ঘরের গৃহিণীর মত তো কর্তব্যের বোঝা ঘাড়ে এসে পড়ে ঘাড় ভাঙে না এঁদের, কর্তব্য-কর্মকে এঁরা চাঁপার কলির আঙুলে সাবধানে তুলে নেন।

তাই পৌত্রসন্তানের আগমনবার্তার আভাস দাসী এসে জানিয়ে যায়।

নিশ্বাস ফেলে বারান্দা থেকে সরে এলেন সরমা। পুত্রবধূকে একবার

দেখতে যাওয়া দরকার। দেখেন রোজই একবার করে, তবু আজকে আর-একবার একটু আনুষ্ঠানিকভাবে যেতে হবে—নিয়মছাড়া, বাড়তি।

বাইরের কাজ, আলোচনা আর পরামর্শ এসব প্রবল হয়ে উঠেছে শোভন-রামের, বাঁধাধরা নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে প্রায়শই। তাই কাছারি-বাড়ির পেটা ঘড়িতে দশটা ঘণ্টা বাজার পরও আজকাল অপেক্ষা করতে হয় সরমাকে।

রাতের আহার সারেন শোভনরাম বাবুর্চীখানার হেফাজতে, তাই সরমার জন্যে থাকে শুধু অনেকখানি নির্জন নিস্তরঙ্গ শীতল সময়ের স্তূপ। সন্ধ্যার আগে পুত্র এসে দেখা করে যায় ঘণ্টা মিনিট হিসেব করে, পুত্রবধূ আসে আহারকালে। তার পর আর কেই বা?

নববধূর প্রতীক্ষার অনুভূতি অক্ষয় হয়ে আছে চল্লিশের প্রান্তসীমাতেও।

দশ আঙুলের আটটা আংটি, একে একে খুলে রাখলেন শোভনরাম কাশ্মীরী-টেবিলে-রাখা রুপোর রেকাবিটার ওপর, এর পর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে কোঁচানো সিমলের ধুতি, মিহি সিল্কের গেঞ্জি, অপেক্ষা করছে আতরের শিশি।

আর অপেক্ষা করছে একটি কোমল দেহবল্লরী।

রঙিন আবরণের মধ্যে থেকে জ্বলছে মৃদু মোমবাতির শিখা।

রাত হয়েছে বলে খুব মান হয়েছে তো মানিনীর?

মৃদু হাসলেন শোভনরাম। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস শোভনরামের, তবু নব যুবকের গঠনসৌকর্য তাঁর দেহে।

কে বললে মান হয়েছে?—এলায়িত ভঙ্গি থেকে উঠে বসলেন সরমা।

বলবে আর কোন্ বাইরের লোক? বলছে মুখ চোখ ঠোঁট।

ছাই পড়তে শিখেছ। পড়া ভুল হল।

মানব কেন? প্রত্যক্ষ দেখছি। মানে টসটস করছে মুখ চোখ ঠোঁট।

মান ছাড়া আর-কিছু নেই জগতে?

আছে অবশ্যই, কিন্তু কী তাই ভাবছি।

ধুতি বদলে রুপোর পাত-মোড়া পিতলের চৌকি বেয়ে 'পক্ষীর পেটে'র মধ্যে এসে বসলেন শোভনরাম মাখন-তুলতুলে বিছানায়।

টানা-পাখাটা একটু বেশী নড়ে উঠল।

সামান্য শব্দের সংকেতও টের পায় বাইরের ঘুমচোখ ছেলেটা।

সরমা একটু হাত তুলে বললেন, আহ্লাদেও টসটস করতে পারে।

বাইরের নানা ব্যাপারে শোভনরাম অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, তাই হাস্য-পরিহাসেও তেমন আবেগ নেই। তবু হাসলেন, বললেন, হঠাৎ এত কী আহ্লাদের কারণ ঘটল?

ঘটল বইকি, ভীষণ ঘটল।—হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠলেন সরমা: মস্ত বড় সুসংবাদ আছে যে।

এ হাসিতে থতমত খেলেন শোভনরাম। বললেন, কী ব্যাপার বল তো?

সরমার চাইতে পাঁচ বছরের বড় শোভনরাম, কিন্তু সরমার কাছে মাঝে মাঝে নাবালক দেখায় তাঁকে।

ব্যাপার! ব্যাপার!—আবার হেসে ওঠেন সরমা: নাতি হবে যে গো।

অ্যাঁ!—চমকে সোজা হয়ে বসলেন শোভনরাম।

ও মা, ও কী, অত চমকাচ্ছ কেন?

হাসি যেন থামতেই চায় না সরমার।

শোভনরাম একটু চুপ করে থেকে বলেন, কুমারের বউয়ের বয়েস কত?

আঠারো।

অতএব আর কী বলা চলে? এ বয়সে সরমার কোলে কুমার তিন বছরের।

ঠিক খবর জেনেছ?

তা জানলাম বইকি। ও ভুল হয় না।

শোভনরাম কেমন অসহায়তা বোধ করেন। যেন সরমার ঠিক নাগাল পাচ্ছেন না। গোবিন্দরামের বংশধারা যে নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, সে নিয়ম তো শোভনরামের অজানা নয়। তাই যে সংবাদে নিতান্ত উৎফুল্ল হবার কথা, সে সংবাদে একটা গভীর শূন্যতা অনুভব করেন শোভনরাম।

আর-একটু চুপ করে থেকে শোভনরাম একটু ক্ষুব্ধ হাসির মত করে বলেন, তা হলে আমাদের মেয়াদ ফুরোল?

গলাটা ভারি করুণ শোনায় শোভনরামের।

গত কয়েক ঘণ্টা ধরে হয়তো ঠিক এই কথা ভাবছিলেন সরমা, কিন্তু কী যে হল, শোভনরামের এই নিরুপায় ক্ষুব্ধ হাসি আর করুণ আকৃতির স্বরে যেন বারুদের মত দপ করে জ্বলে উঠলেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, মেয়াদ ফুরোল মানে?

শোভনরাম আরও হতাশভাবে বললেন, মানে আর কী! জান তো সবই।

জানি, কিন্তু মানব না।

হয়তো এই মুহূর্তেই এ সংকল্প-মন্ত্র পাঠ করলেন সরমা, তবু দৃঢ়সংকল্পের স্বরে ঘোষণা করলেন, তোমাদের বংশের ওই পচা পুরনো নিয়ম আমি ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেব।

রঙিন কাচের মধ্যে গলে গলে পড়ছে তপ্ত মোম, সেই আলোয় লাবণ্যের জ্যোৎস্না লাবণ্যের জোয়ার হয়ে উঠেছে। এই মোহময় আলোয় এ ঘরের কোনখানের কোন জীর্ণতা ধরা পড়ছে না, ধরা পড়ছে না কালের ছায়াচ্ছন্ন ছাপ।

শোভনরাম সহসা দু হাতের মুঠোয় একখানা নরম মুঠো চেপে ধরে রুদ্ধস্বরে বলে উঠলেন, তা হয়?

সরমা নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন, না হবার কী আছে? তোমাদের সদর দুনিয়ায় তো কত রদবদল হচ্ছে, আমার অন্দরেই বা কিছু হবে না কেন?

কিন্তু—। হাতটা ছেড়ে দিলেন শোভনরাম : সত্যিই কি তা সম্ভব?

চুপচাপ থাক, সম্ভব কি না দেখ।—সরমা মধুর একটা আলস্যের ভঙ্গি করে শুয়ে পড়ে বললেন, নতুন মহলও এমন কিছু খারাপ নয়। আরও কিছু নতুন ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে।

শোভনরাম সাটিনের বালিশে কনুইটা চেপে এই মধুর আলস্যের ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মত বলে উঠলেন, কুমার কিছু ভাববে না তো?

ভাববে আবার কী!—সরমা চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে আলো আড়াল করে বললেন, আমি কারোকে বঞ্চিত করে দখল করি নি, বিয়ের কনে এসে এ ঘরে ঢুকেছি, এই ঘর থেকেই একেবারে গঙ্গায় যাব।

শাশুড়ী-হীন গৃহে ঢুকেছিলেন সরমা একেবারে 'পক্ষীমহলে'র অধিকার নিয়ে, সেই কথার উল্লেখ করলেন।

শোভনরাম আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, বউমা এসব নিয়ম-কানুনের কথা জানেন?

সরমা আগের চাইতেও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললেন, জানতেও পারে। না জানলেও জানিয়ে দেবার মত হিতৈষীর অভাব নেই।

শোভনরাম আংটিহীন হাতের থাবার মৃদু আর ভারী একটু চাপ দিলেন পার্শ্ববর্তিনীর গায়ে: তোমার ব্যবস্থা তো হল। আর আমার? আমাকে তো সেই বারমহলে যেতে হবে?

হ্যাঁ, হবে।—অনেকগুলো অলঙ্কারপরা একটা হাত এসে সে হাতের উপর পড়ল, আমার জন্যেই তো এই ময়ূরপঙ্খী আগলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি!

সংকল্প-মন্ত্র পাঠ হয়েছে, তবু মিথ্যা একটা আশার ছলনা। এ খবর ভুলও তো হতে পারে। এ খবর ভুল হয়, আরও কত কী হয়! মনে মনে একবার শিউরে উঠেও মনের মধ্যে একটি গোপনতম আশার আশ্বাস বহন করতে লাগলেন সরমা।

কী জানি কী হয়। প্রথম গর্ভিনীর জন্য তোলা থাকে কত বিঘ্ন বিপদ, কত অঘটন!

কিন্তু সরমার গোপনতম আশার চিন্তার ফেনা ক্রমশ জমাট হয়ে আসে, ক্রমশ দিন নিকটবর্তী হতে থাকে, বিনা বিঘ্নে। দ্বিধাগ্রস্ত মনকে অবশেষে স্থির করে ফেলেন সরমা।

সত্যি, এ কেন!

কেন তুচ্ছ একটা সংস্কার, অদৃশ্য একটা নিষেধ এমন করে ফাঁসির দড়ি টেনে দেবে তাঁদের গলায়? আর কেনই বা তিনি অজ্ঞাতসারেও একটা অনাগত প্রাণের অকল্যাণ কামনা করে বসবেন? বরং এই ভাল। এই ভাল। এই নিয়মকে তুচ্ছ করে ফেলা।

যে মানুষটা এক শো বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, কী অধিকার আছে তার আজকের পৃথিবীর ওপর নিষেধের গণ্ডি কাটতে? কী অধিকার আছে সেই গণ্ডি কেটে দুটো জীবনের মধ্যে একটা বিদারণ-রেখা আঁকতে?

না, এসব মানবেন না সরমা।

ত্যাগ করবেন না পক্ষীমহল।

শোভনরাম আগে ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত, সন্দেহাকুল, সঙ্কুচিত। সরমার সাহস-বাক্যে সে ভাব বদলেছে। এখন যা আছে সে হচ্ছে কৃতার্থম্মন্যতা। যেটা শোভনরামের নিজের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেটা সরমা সম্ভব করলেন, এতে আর কৃতকৃতার্থ হয়ে যাবেন না শোভনরাম!

শুধু কুমারের মুখোমুখি হতেই যা লজ্জা। শোভনরাম এ বংশে ব্যতিক্রম বইকি। যে বংশে ঐতিহ্য আর গৌরব ছিল বাপে-ছেলেতে একসঙ্গে বসে মদ খাওয়ায়, সে বংশের পুরুষ হয়ে শোভনরাম এই তুচ্ছ ব্যাপারে লজ্জিত হচ্ছেন ছেলের কাছে?

এ বাড়ির বউ বাপের বাড়ি যায় না।

কুমারের বউও যায় নি, এখানেই আছে।

তার চলনে বলনে মন্থরতা।

ওদিকে বাকী সমস্ত মহল মন্থর হয়ে উঠেছে সরমার সমালোচনায়। সমালোচনাকারিণীরা অবশ্য দূর-সম্পর্কের গা-ঘেঁষা, আশ্রিতা আর দাসদাসী, তবু তাদের রসনাও কম বিষোদ্গারী নয়। সরমা যে পত্নীমহল থেকে নড়বার নাম করছেন না, এর চাইতে নির্লজ্জতা আর কী আছে?

কুমারের বউ আঁতুড়ঘরে আশ্রয় পেল, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনাও প্রায় কানের ধারে-কাছে আসতে লাগল। সরমা কিন্তু আত্মস্থ নির্বিকার। পৌত্র-জন্মের মুহূর্তেই তিনি, যাকে বলে ভাঁড়ার ভেঙে, ধন বিললেন, দিলেন পূজ্য-পূজনীয়াদের মোটা প্রণামী, মন্দিরে মন্দিরে পাঠালেন মানসিক পুজো।

নিজের বধূকালের জড়োয়ার নেকলেস দিয়ে মুখ দেখলেন পৌত্রের, শোভনরামকে দিয়ে দেওয়ালেন গিনির মালা। কোথাও কোনখানে খুঁত না থাকে। যদি এই নিখুঁত কর্তব্যনিষ্ঠার চাকচিক্যের আড়ালে চাপা পড়ে যায় এতটুকু সেই দুর্বলতার ইতিহাস।

কিন্তু তবু চাপা পড়ে না।

মানুষের ক্রূরতা অপরের দুর্বলতার ছিদ্রেই দৃষ্টি হেনে বেড়ায়।

শোভনরামের তীর্থবাসিনী বিধবা দিদি সুদীর্ঘকাল পরে পিত্রালয়ে এলেন ভাইপোর ছেলে দেখতে। দেখতে গোবিন্দরামের বংশধারার সদ্য ধারাটিকে।

সেদিন নবজাতকের 'যেঠেরা-পুজো'র উৎসব চলছে।

সরমাকে সঙ্গে করে বরদামোহিনী বউ-মহলে পদার্পণ করলেন, সোনার হার দিয়ে নাতির মুখ দেখলেন, তার পরই একথা সেকথার প্রসঙ্গে বলে উঠলেন, কই বউরানী, পঞ্চীমহলে তো মিস্ত্রী লাগতে দেখলাম না?

বরদামোহিনীর কাছে সরমা আজও 'বউরানী'। ননদিনীর প্রশ্নে সরমার মুখটা একবার সাদা হয়ে গিয়েই লাল হয়ে উঠল। তবু বাঁকা কটাক্ষে তিনি একবার পুত্রবধূ সুলক্ষণার দিকে তাকিয়ে সহজভাবেই উত্তর দিলেন, এই তো ক বছর আগে একবার রঙ হয়েছে।

শোন কথা!—বরদামোহিনী গালে হাত দিলেন: চিরকালই রেওয়াজ আছে নতুন বউ নতুন খোকা নিয়ে মহলে ঢোকবার আগে মহল রঙ করা হয়, পঞ্চীপালঙ্কে পালিশ লাগানো হয়, ঝাড়ের বাতি বদলানো হয়, তুমি সে সব ধারা পালটে দেবে না কি? এই তো ক দিন পরেই রানীবউমা পঞ্চীমহলে ঢুকবেন।

সরমার সেই সুকুমার মুখের ডৌলটা হঠাৎ ভারি কঠিন দেখাল, ঠোঁটের রেখায় একটা বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, কী যেন বলতে গেলেন, কিন্তু বলা হল না।

বরদামোহিনীর কথার পিঠে আদবকায়দায় কম-দুরন্ত সুলক্ষণা থপ করে বলে উঠল, রক্ষে করুন পিসীমা, আপনাদের ওই পঞ্চীমহলে কাজ নেই আমার। বাবাঃ, দেখলেই দম বন্ধ হয়ে আসে, ঘর তো নয়, যেন শ্মশানপুরী। তার চাইতে আপনাদের ওই নতুন মহল অনেক ভাল। ওখানেই বেশ থাকব আমি।

কে জানে কোথা দিয়ে কী হল, কে জানে টান-টান করে বাঁধা কোন্ সুরযন্ত্রের কোথাকার কোন্ তার ঝন্ঝন্ করে ছিঁড়ে পড়ল, মুখের সেই কঠিন অভিব্যক্তি নিয়ে সরমা বিষতীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠলেন, তোমার খেয়াল-খুশির তালে এ সংসারের নিয়মকানুন চলবে না রানীবউমা। একুশে ষষ্ঠীর পুজো মিটলেই তোমাকে পঞ্চীমহলে গিয়ে ঢুকতে হবে। মেরামতের কোনও দরকার নেই, খুব ভাল অবস্থাতেই আছে।

নতুন বউ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সরমার এই আকস্মিক বিষবাণে। সে ফ্যালফ্যাল করে একবার তাকাল শাশুড়ীর মুখের দিকে, তার পর অস্ফুট স্বরে বলে ফেলল, ও-মহলটা দেখলে আমার কেমন ভয় করে।

ভয় করে, ভয় ভাঙবে।—বলে এ ঘর থেকে উঠে যান সরমা।

রাজ্রে অবাক হতাশ ব্যথাহত শোভনরাম দুর্বল গলায় বলেন, তবে যে এতদিন ধরে বলে এলে—

বলে এলাম কী—সত্যি নাকি ?—সরমা নিস্পৃহ নিরাসক্ত গলায় বলেন, এতটা বয়েস হল ঠাট্টা বোঝ না ?

বুক ফেটে যাচ্ছে বইকি, ফেটে যেতে চাইছে চোখের সমস্ত স্নায়ুশিরাগুলো, তবু কঠিন হয়ে থাকতে হবে। মুহূর্তের অসহিষ্ণুতায় যে অবিমৃষ্যকারিতা করে বসেছেন সরমা, বাকী জীবনটা তার জের টেনেই চলতে হবে। এর পরে আর কোন ছলেই আগলে রাখা চলে না পল্লীমহলের রানীগিরি। এতদিনের এত কলাকৌশল, এত ছল, নিষ্ঠুর সত্যটাকে চোখ বুজে উড়িয়ে দেবার মিথ্যা ভান, সবই ধসে পড়ল ক্ষণিক অসতর্কতায় !

কিন্তু সরমা কী করবেন ?

আগুন যখন জ্বলে, তখন কি ভেবে-চিন্তে ঘর পোড়ায় ?

যে স্বর্গের বিনিময়ে সিন্দুকের সমস্ত সোনা অনায়াসে উজাড় করে দিতে পারেন সরমা, যে স্বর্গ বজায় রাখতে সরমা বিসর্জন দিতে বসেছিলেন সম্ভ্রম আর মর্যাদা, যে স্বর্গ সরমার সর্বস্ব, সেই স্বর্গের প্রতি যদি কেউ নিতান্ত অবহেলায় অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে বসে, মাথার রক্ত কি মুহূর্তে টগবগিয়ে ওঠে না ?

নিজেকে কী দীন, কী ছোট, আর কত হ্যাংলা মনে হয় অপর ব্যক্তির সেই হতশ্রদ্ধার ভাষায় !

নিজে ধ্বংস হয়ে গেলেন সরমা, কিন্তু ওকেও তো জব্দ করা হল।

॥ ঠাকুরমার ঝুলি ॥

অনেকক্ষণ থেকে মাথাটা ধরা-ধরা লাগছে, পড়তে মন লাগছে না, হাতের বইটা ঠেলে সরিয়ে রেখে সতু ঠাকুরমার চৌকির এক পাশে শুয়ে পড়ে হাই তুলে বলে, ঠাকুমা, পড়া-টড়া ছেড়ে দিচ্ছি, বুঝলে? নবদুর্গা ঘরে হাই-পাওয়ারের লাইট জ্বলা সত্বেও চৌকির এক ধারে টুলের ওপর মোমবাতি জ্বেলে নিবিষ্ট চিত্তে একখানি কাঁথায় ফুল তুলছিলেন। তুলছিলেন অবশ্য বিনা চশমাতেই। তবে মোমবাতির খরচ তাঁর আছে, কারণ কাঁথায় ফুল তোলা তাঁর দুরন্ত নেশা। কেন, কার জন্যে, সে সবের ধার ধারেন না তিনি, একখানি শেষ হলেই আর-একখানিতে হাত দেন। সতু মন্টি ঝুমঝুমি বুলবুলদের মত মাথাধরার বালাই তাঁর নেই। শুধু ওই উঁচু থেকে বিদ্যুতা-লোকে ছুঁচ ঠাহর করতে পারেন না, বলেন, ওসব ইংরিজী আলোটালো তোদেরই ভাল বাছা, আমাদের চোখে শেজের আলোই খাটে।

তাঁদের আমলে রীতিমত বিদুষী বলে গণ্য ছিলেন নাকি নবদুর্গা, তবু বাতিকে বলেন শেজ, এই নিয়ে নাতি-নাতনীরা হাসে। অবশ্যি ঠাকুরমার অনেক কথা নিয়েই হাসে ওরা।

তবে আপাতত নবদুর্গাই নাতির কথায় হেসে ফেললেন। বললেন, কেন, পড়া কী অপরাধ করল?

ভীষণ অপরাধ ঠাকুমা। বেশী বিদ্যে হলে আর চাকরি-বাকরি হবে না।

নবদুর্গা হেসে বলেন, মন উড়ু-উড়ুর বয়স হয়েছে, পড়তে মন লাগছে না তাই বল্! বুড়ী পেয়ে বোকা বোঝাতে আসিস নে।

সত্যি সত্যি—তিন সত্যি ঠাকুমা। মন উড়ু-উড়ু! দূর! এ কি আমাদের ঠাকুরদার আমল গো যে কুড়ি বছরে মন উড়ু-উড়ু করবে? আমরা অত পাকা ছেলে নই।

নবদুর্গা পাকা ভুরুতে ভ্রূভঙ্গি করে বলেন, নাঃ, তা কি আর! করে ঠিকই। তবে চারদিকের গতিক দেখে প্রকাশ করতে ভরসা পাস না এই যা! মনে মনে তো জানিস, মাথার ওপর দুটো দাদা বসে, ঊনচাল্লিশের

আগে তো আর কনে জুটবে না। কিন্তু নেকাপড়ায় কী বললি শুনি? তিন সত্যি তো করে বসলি!

আইন পাস হয়ে গেছে—এম.এ. বি.এ.-রা আর চাকরি পাবে না। বিদ্যেটাই এখন ডিস্‌কোয়ালিফিকেশন—মানে আর কী, দোষের হয়ে গেছে ঠাকুমা।

নবদুর্গা ছুঁচে সুতো পরাবেন বলে বাগিয়ে ধরেছিলেন, সে কাজ স্থগিত রেখে অবাক হয়ে বলেন, এ আবার কী অনাছিষ্টি কথা! এ যে সেই বিদ্যে-সুন্দরের পালার ছড়ার মতন বলছিস। "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।"

ঠিক ঠিক। ঠিক বলেছ ঠাকুমা। এ যুগের নীতিই ওই। একালে গুণই দোষ। এর নাম কালধর্ম।

নবদুর্গা ছুঁচে সুতো পরিয়ে নিয়ে নতুন ফুলে সেটি সংযোজনা করে ধীরে-সুস্থে বলেন, তা যদি বললি ভাই, ও শুধু একালের দোষ নয়, সব কালেরই। আমাদের আমলেও প্রবাদ ছিল, "অতি ঘরুন্তি না পায় ঘর, অতি সুন্দরী না পায় বর।"

সতু ঠাকুমার বালিশটা টেনে নিয়ে গুছিয়ে ঘাড়ের তলায় দিয়ে বলে, সে তো ভাগ্যের বা অদৃষ্টের কথা ঠাকুমা। আইনে এমন ছিল? ধর না কেন, এখানকার দিনে যেমন —

নবদুর্গা ওর কথার মাঝখানেই বিমনাভাবে বলেন, তাও ছিল বইকি। তখন আইন মানেই সমাজ। সমাজে ব্যবস্থাটা কী ছিল বল্? যে যত বড় কুলীনের ঘরের মেয়ে, তার কপালে তত দুর্গতি। কুলীনকন্যে বলে গুমর করলে কী হবে, ওই তোদের চাকরি না কী বলছিস, ওর মতনই তাদের ভাগ্যে আর বর জুটত না। ভঙ্গ-বংশজের গলায় মালা দেওয়া চলবে না, কুলীন বরও জুটবে না। তা হলেই দেখ্ গুণ হয়েই দোষ।

সতুর আপাতত বিমনা মন অলস কৌতূহলে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। সে ঠাকুরমার হাত থেকে সেলাইটা টেনে সরিয়ে দিয়ে বলে, রাখ তোমার শিল্পকলা। তোমাদের সেকালের গল্প বল দেখি।

আমাদের কালের আবার গল্প!

নবদুর্গা নিজের যুগকে নস্যাৎ করে দেন।

আরে মশাই!—সতু হাসতে হাসতে বলে, ওই কুলীন-কন্তেদের গল্পই একটু কর না।

নবদুর্গা ভেবে নিয়ে বলেন, আমাদের আমলে অবশ্যি অত কুলীনে কাণ্ড ছিল না। একটা ঘাটের মড়ার সঙ্গে এক গোটা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কেলেঙ্কারও বন্ধ হয়ে গেছল। তবে শুনেছি। শুনেছি আমাদের ঠাকুমা-দিদিমার কাছে। আমার দিদিমার বড় বোনেরই তো কুল বজায় রাখতে ফুলগাছের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। শেষে সেই বড় বোনই মরণ-কালে বাপকে দিব্যি দিয়ে যান, বংশে যেন এমন কুপ্রথা আর না চলে।

সতু বালিশ থেকে মাথা তুলে বলে, সেকালের বাপ-মাগুলো কী নিষ্ঠুর আর স্বার্থপর ছিল ঠাকুমা! কুল মানে কী? শুধু তো নিজের অহঙ্কার? নিজের অহঙ্কারটি বজায় রাখবার জন্যে মেয়েগুলোর জীবন একেবারে নষ্ট করে দিত।

নবদুর্গা একবার পাশের ঘরের দিকে, অর্থাৎ নিজের ছেলের, ছেলের বউয়ের দিকে কটাক্ষপাত করে বলেন, তা তোদের একালের মা-বাপও কম স্বার্থপর নয় বাপু। একালে তো দেখতে পাচ্ছি—সকল মেয়েরই কুলীনকন্যের দশা। আর ছেলেগুলো সব যেন বংশজের ছেলে।

নবদুর্গা নেহাত অবুঝ বুড়ী নয়, প্রত্যেক বিষয়েই বেশ বুঝমান আছেন, কিন্তু এই একটি বিষয়ে বেজায় অবুঝ। নাতি-নাতনীদের বিয়ের বয়েস চলে যাচ্ছে, অথচ বিয়ে হচ্ছে না—এ তিনি মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন না, এবং এই না-হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত করে রেখেছেন নিজের পুত্র-পুত্রবধূকে। বলেন, ঝঞ্ঝাট আর পয়সা খরচের ভয়ে কর্তা-গিন্নীর এই গাফিলতি। নইলে চেষ্টা করলে নাকি আবার ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় না!

সতু অবশ্য এতবড়ো একটা সামাজিক সমস্যার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না। সে একগুঁয়েমির সুরে বলে, ওসব সেকাল একাল রাখ ঠাকুমা। চিরকালই সেকালের চেয়ে একাল খারাপ হয়ে থাকে। ফুলগাছের সঙ্গে বিয়ে কী জিনিস তাই বল শুনি।

নবদুর্গা পা মুড়ে গুছিয়ে বসে বলেন, আমারও শোনা কথা, তবে প্রত্যক্ষ মানুষটাকে দেখেছি বটে। দিদিমার বোন আমাদের মাসী-দিদিমার কথা বলছি। কাঁচাসোনার মত রঙ, মোমবাতির মত হাত পা,

কাটাচুলে আর একখানা মটকার থানেও চেহারার কী জলুস! দিদিমার বাবা ছিলেন মহাকুলীন। প্রথম মেয়েকে দিয়ে আরও কুলমর্যাদা বাড়াবেন, তাই খোট করে বসে আছেন—নৈকষ্য কুলীন পাব, তবে মেয়ের বিয়ে দেব। মেয়ে এদিকে আঠারো কুড়ি পার হয়ে গেল—

সতু বিস্ফারিত লোচনে বলে, সে কী ঠাকুমা! এত বড় মেয়ের বিয়ে না দিতে পেরে জাত গেল না তাঁর? সেকালে তো শুনেছি মেয়ের দশ বছর বয়েস হলেই জাত যেত।

আহা, সে যাদের যেত তাদের যেত। কুলীনের ঘরে যেত না। কুলীনের ঘরে কত মেয়ে চিরকুমারী থেকে যেত শুনেছি। দিদিমার বাবা অবিশ্যি মেয়ের বিয়ের জন্যে ঘটক লাগিয়েছেন চার দিকে, কিন্তু এমন সোনার প্রতিমে মেয়েকে নেহাত ঘাটের মড়া বিয়ে-ব্যবসা কুলীনের হাতেও সঁপে দিতে ইচ্ছে নেই। তাই দেরি হচ্ছে।

মেয়ের যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন নাকি চাঁদমোহন ঘটক এমন এক পাত্তরের সন্ধান এনে দিল যে, চমকে যাবার মত। ছেলে সুতোনুটিতে কোম্পানির চাকরি করে, জামা গায়ে দেয়, সাহেবদের সঙ্গে কথা কয়। ফারসী পড়ে পণ্ডিত হয়েছে, অথচ নৈকষ্য কুলীন। তার ওপর আবার নাকি রাজপুত্তুরের মত চেহারা। তার ওপর আবার এখনও একটাও বিয়ে করে নি। বলেছে, বড়সড় সোন্দর মেয়ে পেলে এখন বিয়ে করে। ফুলেশ্বরীকে দেখলে তো গলেই যাবে।

শুনে দিদিমার মা তো আহ্লাদে উলসে উঠলেন। আবার যে যেখানে ছিল ঘটককে ধন্যি ধন্যি করতে লাগল। কারণ 'একবরে' বর তখন বৈকুণ্ঠের নারায়ণের মত দুর্লভ। তার ওপর আবার কোম্পানির চাকরে! নবাবই বা কে, সেই বা কে?

কিন্তু দিদিমার বাবা রামতারণ মুখুজ্জে বেঁকে বসলেন। বললেন, সাহেবের ঘরে চাকরি করে, তার কি আর জাত আছে? যে ছেলের ব্রাহ্মণত্ব বজায় আছে, এমন পাত্তর যোগাড় কর চাঁদমোহন।

চাঁদমোহন ঘটক জিভ কেটে বলল, আ ছি-ছি মুখুজ্জে মশাই, এ আপনি বলছেন কী? আমি কি আর না জেনে-শুনে এ খবর এনেছি? মহা নিষ্ঠাবান ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী না করে জলগ্রহণ করে না, নিত্য ভাগবতপাঠ, চণ্ডীপাঠ, স্বপাক অন্ন আহার, কিছুর ত্রুটি নেই। তবে হ্যাঁ,

কোম্পানির কাজ করে বটে। কিন্তু তাতে কী? তাদের স্পর্শ করে নি একদিনের জন্যেও।

রামতারণ হেসে বললেন, ম্লেচ্ছর অন্ন তো খাচ্ছে? সে যে স্পর্শের বাবা চাঁদমোহন।

চাঁদমোহন বলল, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না মুখুজ্জে মশাই, মেলেচ্ছর দেওয়া বেতনের চাঁদিমোহর সে কড়ে আঙুলেও ছোঁয় না। বেতনের সময় তার কারকুন হারাণ কায়েত হাতে করে নেয়, তারপর গঙ্গায় চুবিয়ে এনে তবে রাজমোহনের হাতে দেয়।

রাজমোহন কে?

কী গেরো! ওই তো নাম পাত্তরের। তা সেই রাজমোহন আবার সেই মুদ্রা তুলসীর দ্বারা শোধিত করে নিয়ে তবে গ্রহণ করে।

দরজার আড়াল থেকে ফুলেশ্বরীর মা বীরেশ্বরী মুহুর্মুহু পুলকে কম্পিত হতে থাকেন। আবার মুহুর্মুহু হতাশায় ভেঙে পড়তে থাকেন। স্বামীর মুখ তো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। দরজার আড়ালে থাকলেও একগলা ঘোমটা টানা, শুধু গলার স্বর থেকে ভাব ধরতে চেষ্টা করছেন। আশায় আশায় ভাবলেন, তুলসীর দ্বারা শোধনের খবর জানার পর রামতারণ অবশ্যই নরম হবেন, কিন্তু তেমন ভাব কই? রামতারণ বললেন, মুদ্রা শুদ্ধি করলে আর কী হবে চাঁদমোহন? দোষ তো মুদ্রাখণ্ডে লেগে থাকে না, দোষ তার উপস্বত্ব গ্রহণে।

চাঁদমোহনও তেমনি ধড়িবাজ। বলল, আজ্ঞে, তা যদি বললেন তো বলি—গোবিন্দপুরে পৈতৃক ধানজমি আছে পঞ্চাশ বিঘে, তাতেই সম্বচ্ছরের ভাত কাপড় চলে। তা ছাড়া বাগানে ফল, পুকুরে মাছ, উঠনে তরকারি—

রামতারণ কৌতূহলী হয়ে জানতে চান, তা হলে বেতনের মুদ্রা কী হয়?

চাঁদমোহন তৎক্ষণাৎ বলল, আজ্ঞে, গরিব দুঃখীকে বিলোয়।

মিছে কথা তো আর ঘটক মুখপোড়াদের মুখে আটকাত না।

বীরেশ্বরীর প্রাণটা করকর করে উঠল।

হায়! হায়! অত টাকা বিলিয়ে নষ্ট করে! সে সংসার আমার ফুলুর হাতে পড়লে—

কিন্তু বিলোনোর কথায় রামতারণ যেন একটু সন্তুষ্ট হলেন। বললেন,

সেটা ভাল কথা। কিন্তু ওই যে বললে পিরহান্ গায়ে দেয়, ওতেই যেন মনটা কেমন সায় দিচ্ছে না। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বস্ত্র আর উত্তরীয়ই প্রকৃত সাজ।

চাঁদমোহন সঙ্গে সঙ্গে বলল, আজ্ঞে মুখুজ্জে মশাই, গোরা ব্যাটাদের যে আবার অনেক কৈফিয়ত। পিরহান্ গায়ে না দিয়ে ওদের দপ্তরে কাজ করা চলবে না। বাধ্য হয়ে পরতে হয়। তবে আমাদের সেই পাত্রটি গৃহে প্রত্যাগমন করে গঙ্গাজল দ্বারা গাত্র মার্জনা না করে জলগ্রহণ করে না।

রামতারণ তবুও 'কিন্তু' তুলছিলেন, কিন্তু বীরেশ্বরী আর থাকতে পারলেন না। শাঁখা খাড়ু লোহা সবগুলো ঝনাত ঝনাত করে বাজাতে শুরু করলেন।

চাঁদমোহন অবহিত হয়ে বলল, মুখুজ্জে মশাই, দেখুন, মা-জননী বোধ হয় কিছু বলছেন।

অগত্যা মুখুজ্জে মশাই ফিরে দাঁড়ালেন।

বীরেশ্বরী আকুল হয়ে ফিসফিস করে বললেন, ওগো, তুমি আর ওজর-আপত্তি কোর না, আমার ফুলুকে ওই বরের হাতেই দাও।

রামতারণ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, ফুলি আমার প্রথম সন্তান, ভেবে-ছিলাম ওকে এমন ঘরে দেব যে, ওপর থেকে সাত পুরুষ আশীর্বাদ করবেন।

বীরেশ্বরী চোখ মুছে বললেন, তোমরা শুধু ঘরই দেখবে, বর দেখবে না?

রামতারণ গম্ভীরভাবে বললেন, বর কী এমন ভাল দেখছ তুমি? ম্লেচ্ছের দাস—

বীরেশ্বরী বাইশ বছরের মেয়ে বুকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাই সাহস না বেড়ে উপায় কী? তিনি বললেন, কোম্পানির চাকরি এখন অনেকেই করছে। এর পর দেখো সবাই করবে। অত বিচার কোথায় থাকবে তোমাদের?

যতদিন থাকে।

তোমার পিসির মত জন্ম-আইবুড়ী করে রাখতে চাও আমার সোনার ফুলুকে?

রামতারণ বিবর্ণ মুখে বললেন, আমার পিসি ফুলির চাইতে দশগুণ সুন্দরী ছিলেন।

ওসব কথা আমি জানি না, তুমি এই ছেলেরই ভাল করে খোঁজপত্তর কর। ঘটক ঠাকুর তো বললেন, ফুলে মেল, বহু ঠাকুরের বংশ—

রামতারণ গলা নামিয়ে বললেন, ঘটক ঠাকুররা অমন অনেক কথাই বলে থাকেন। সে কথা যাক। বেশ, আমি অনুসন্ধান করব।

হয়তো কোনখানে একটু বাপের প্রাণ ছিল, তাই রামতারণ মুখুজ্জে তখনকার মত নরম হলেন। তারপর শুনতে পাই, নিজেই নাকি তিনি একদিন চাঁদমোহন ঘটককে সঙ্গে নিয়ে নৌকো করে সুতোনুটি গেলেন। ঘটকের কপাল ভাল, রাজমোহন নাকি তখন কোম্পানির দপ্তর থেকে ফিরে সদ্য স্নান করে উঠেছেন। সন্ধ্যা হয়-হয়, সেই ঝিকিমিকি বেলায় পাত্তর দেখলেন রামতারণ। খালি গা, আগুনের মত টকটকে রঙ, লম্বাচওড়া দেহ, গলায় ধবধবে পৈতের গোছা, সদ্য-স্নাত ব্রাহ্মণ। দেখে রামতারণ কেমন হয়ে গেলেন, বিপরীত ভাবটা কাটল। ঘটককে বললেন, কথাবার্তা কও।

ঘটকের কথা বুঝতেই পারছিস। এমনিতেই তো বড় দিদিমা সত্যিই পরমা সুন্দরী ছিলেন, তার ওপর ঘটকের বর্ণনা—মেয়ে হাসলে মুক্তো ঝরে, হেঁটে গেলে পদ্ম ফোটে। সবের ওপর রামতারণের ঘর।

রাজমোহনের বুঝি আর সবুর সয় না। তবু ধীরস্থিরভাবেই কথা কইলেন, বিদ্যে ছিল তো পেটে। মাথার ওপর কেউ নেই, নিজেই নিজের অভিভাবক। কাজে-কাজেই সঙ্গে-সঙ্গেই সব কথা হয়ে গেল। আর কুলীনের মেয়ের বিয়ের এত কথাই বা কী! শুধু চোদ্দ পুরুষের ঠিকুজি-কুলুজিটা দেখে একবার মিলিয়ে নেওয়া—কোনও পক্ষের কোথাও কোনখানে কুলভঙ্গ হয়েছে কি না!

রাজমোহনের কুলপঞ্জী ছিল, রামতারণ দেখে-শুনে সন্তুষ্ট হলেন। সঙ্গে-সঙ্গেই শুভলগ্ন দেখে দিন স্থির করে ফেলে বিদায় নিলেন রামতারণ।

ঘটকের মুখে মুখে দু দিনের মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হয়ে গেল, ফুলেশ্বরীর যা বর হচ্ছে, এমন কেউ কখনও দেখে নি, শোনে নি। লোকের কথায় কথায় পাত্তরের এক গুণ এক শো গুণ হয়ে দাঁড়াল।

ফুলেশ্বরী সবই শুনছে।

বুঝতেই পারছিল তার মনের অবস্থা। বিয়ের আশা তো বলতে গেলে কোনকালে করেই নি, এদানীং তো একেবারে সে আশা ছেড়েই দিয়েছিল। হঠাৎ এই সংবাদ! যেন পথের কাঙালের কাছে রাজার রাজত্ব। তোরা তো নাটক-নভেল পড়িস, ভেবে দেখ্ কী স্বপনে বিভোর হয়ে আছে সে! দিদিমার মুখে শুনেছি—'তখন আমার বয়েস নেহাত কম, তবু বুঝতে পারতাম, আহ্লাদে দিদির রূপ যেন আরও ফেটে পড়ছে।' বিয়ের কথা পাকা হওয়া অবধি—মা-পিসি জ্ঞাত-গোত্তর পাড়া-পড়শী সকলের কাছেই যেন ফুলেশ্বরীর আদর বেড়ে গেল। একে 'একবরে' বর, তায় আবার ফারসী-জানা, মোটা-বেতনের চাকুরে বর। রামতারণের মতন আড়বুঝো তো কেউ নয়। সকলেই জানে, টাকার মতন জিনিস নেই।

ফুলেশ্বরীর বরের নাকি এক কুড়ি পাঁচ টাকা মাইনে।

সতু হো-হো করে হেসে ওঠে, কী, আমাদের বামুন ঠাকুরের চাইতেও কিছু কম?

নবদুর্গা হাসলেন।

তেমনি তখন টাকায় ছ মণ চাল ছিল। সে যা হোক, ফুলেশ্বরী তো হাওয়ায় ভাসছে। ওদিকে আনন্দনাড়ুর চাল কোটা হচ্ছে, বড়ি দেওয়া হচ্ছে, সুপুরি কাটা, সলতে পাকানো হচ্ছে, তাঁতীদের ঘরে কাপড়ের বায়না দেওয়া হয়েছে। রামতারণ মুখুজ্জের অবস্থা ভালই ছিল, কাজেই ফুলেশ্বরীর বিয়ের আলোচনায় গাঁ বেশ সরগরম রইল কদিন। তারপর এল বিয়ের দিন।

ফুলেশ্বরীকে হলুদ-মাখা কোরা তাঁতের লালপাড় শাড়ি ছাড়িয়ে বালুচরী চেলি পরিয়ে দেওয়া হল, কানে ঢেঁড়ি-ঝুমকো, হাতে পিন্‌খাড়ু, গলায় চিক। কুলীনের মেয়ের এত গয়না হবার কথা নয়, কিন্তু বীরেশ্বরীর বাবা প্রথম দৌহিত্রীর বিয়েতে যৌতুক দিয়েছিলেন এ-সব। বাইশ বছরের ফুলেশ্বরী বারো বছরের মেয়ের মতন চেলিতে, কনেচন্দনেতে আর ঘামেতে একাকার হয়ে পিঁড়েয় বসে আছে চণ্ডীর পুঁথি কোলে করে। একজন ঠানদি এসে বর-বশ-করানোর তুক করে গেলেন; এয়োরা কুলো ডালা সাজিয়ে বসে, কিন্তু বর আর আসে না।

নৌকো করে বর আসবে। গঙ্গার ঘাটে লোক মোতায়েন, বাজনদারে

থাকা, বরের দেখা নেই। ওদিকে লগ্ন বয়ে যায়-যায়। প্রথমে ছুটোছুটি হাঁকাহাঁকি, তারপর কান্নাকাটি পড়ে গেল বাড়িতে। মেয়ে দ'পড়া হয়ে গেলে, জন্মের মতন গেল।

দ'পড়া!—সতু অবাক হয়ে বলে, সেটা আবার কী বস্তু ঠাকুমা?

ও মা! দ'পড়া জানিস না? বিয়ের রাতে কোনও দুর্বিপাকে লগ্ন-ভ্রষ্ট হয়ে গেলেই মেয়ে দ'পড়া হয়ে গেল। সে মেয়ে জন্মের শোধ না-সধবা, না-বিধবা, না-আইবুড়ো হয়ে রইল।

পুরুত বললেন, সেই কথা। বললেন, লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে আর জাতিভ্রষ্টা মেয়ে একই কথা। এই লগ্নেই মেয়ে সম্প্রদান করতে না পারলে মুখুজ্জে মশাইও পতিত হবেন।

মুখুজ্জে মশাই পতিত হবেন! বোঝ্ কথা! নিজেই যিনি সমাজের মণি, বিধানদাতা, তিনি সইবেন এত বড় অপমানের কথা! রামতারণ মুখুজ্জের বংশে কেউ কখনও এত বড় অপমানের কথা শোনে নি। রাম-তারণ অন্ধকার মুখে বললেন, ঠিক আছে, মেয়ে আমি এই লগ্নেই সম্প্রদান করব। সম্প্রদানের যোগাড় উঠনে নিয়ে যাওয়া হোক।

উঠনে সম্প্রদানের যোগাড়!

শুনে তো সবাই হাঁ।

ব্যাপার কী রে বাবা! ব্যাপার আর-কিছু নয়, উঠনের গন্ধরাজ গাছটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে। শুনে কর্তামা বীরেশ্বরী ডুকরে কেঁদে উঠলেন, ওগো, অমন সর্বনাশ কোর না, ওর যে ভাল বর আসছে।

ধমকের চোটে তাঁকে চুপ করিয়ে দেওয়া হল।

সামান্য একটা মেয়ে আগে, না, বংশমর্যাদা আগে? এ তো তবু ভাল, সধবা মেয়ের যা মানসম্ভ্রম, তার সবটাই পাবে ফুলেশ্বরী। আর দ'পড়া হয়ে থাকলে যে কিছুরই অধিকারিণী নয়।

কপালের কনে-চন্দন অনেকক্ষণ মুছে গেছে, বালুচরী চেলি ঘামে ভিজে লেপটে গেছে গায়ের সঙ্গে, চণ্ডীর পুঁথি কোল থেকে পড়-পড়। পিঁড়িতে-বসা ফুলেশ্বরীকে নিয়ে চার-পাঁচ জন ভগ্নীপতি-সম্পর্ক গন্ধরাজ গাছটার সঙ্গে সাতপাকে বাঁধল। শুভদৃষ্টি আকাশের তারার সঙ্গে। পুরুত বললেন,

আকাশের দিকে তাকাও মা, নক্ষত্রের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হোক। নক্ষত্রের দৃষ্টিকেই পতির দৃষ্টি মনে করে চিরদিন সতীত্ব-ধর্মে অটল থাকবে।

নাপিত ছড়া কাটতে শুরু করল—

ভালমন্দ লোক থাক তো সরে যাও।
ভালমন্দ লোক থাক তো সরে যাও।
মন্দ-চোখে যে চাইবে—
সে নিজের চোখের মাথা খাবে।
সাত জন্ম 'কানী' হবে, মহাব্যাধি কুষ্ঠ হবে।
তুকতাক যে করবে, তার আমার মতন হাত হবে,
একমুঠো চাল ছ মাস খাবে,
বোগ্‌নো বেড়ি সার হবে।

কার জন্যে এই রক্ষেকবচ, কাকে নিয়ে তুকতাক, সে ধার কে ধারে? বিয়ে যখন হচ্ছে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি না হয়! ছাঁদনাতলা থেকে সম্প্রদান পর্যন্ত সব সারা হয়ে কনেকে যেই গন্ধরাজ গাছের সঙ্গে গাঁটছাড়া বাঁধা হচ্ছে, হঠাৎ বাইরের বাজনা বেজে উঠল। 'বর এসেছে—বর এসেছে।' বাজন্দরেরা ঘাট থেকে বরের সঙ্গে বাজাতে বাজাতে এসেছে! কী সর্বনাশ! এখন বর এল! যখন সব শেষ! বর আসেনি বলে যে যন্তরনা হচ্ছিল লোকের, বর এসেছে শুনে তার দ্বিগুণ হল। হায় হায়! কী দুর্ভাগা কপাল মেয়েটার! সম্প্রদান হয়ে গেল, এখন বাজনা বাজিয়ে এল রাজপুত্তুরের মতন বর!

কাঠ হয়ে গেল বাড়িসুদ্ধু সবাই।

পাড়ার লোকের বর দেখতে ঝুটোপুটি লেগে গেল।

আর-সবাই একবার করে দেখে এসে গালে হাত দিয়ে বসল। হায় ভগবান, কী বঞ্চিত অদৃষ্ট মেয়েটার! এই স্বামীর হাতে পড়তে পেল না! না-সাপ না-ব্যাঙ হয়ে বসে রইল!

সতু উঠে বসে বলে, কী পাগলের মত বকছ ঠাকুমা? সত্যি বরটার সঙ্গে সত্যি বিয়ে হল না?

তুই এক ক্ষ্যাপা! তাই কখনও হয়? বাপ একবার দানের মন্তর পড়ে ফেলেছে, আবার পড়বে নাকি? বরপক্ষকে চেপে ধরা হল, বিলম্ব

কিসের? কুলীনকন্যার লগ্নভ্রষ্ট করিয়ে দাও, জীবন নষ্ট করে দাও, এমন আক্কেল?

ওরা হাত জোড় করে বলল, উপায় ছিল না। গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছিল। মাঝিরা নৌকো ছাড়তে চায় নি।

বেশ হয়েছে, এখন কলা খাও।

কনে হাতছাড়া।

দু পক্ষে বিরাট এক বচসা। ওরাও দোষ মানবে না, এঁরাও দোষ মানিয়ে ছাড়বেন। কথা থেকে বচসা, হাতাহাতি, শেষ পর্যন্ত লাঠালাঠির যোগাড়। কী, না পাড়ার আর কারুর মেয়ে বিয়ে করে যাও।

বরের কপালের চন্দন মুছে গিয়েছিল, বেগনী বেনারসীর জোড় ঘামে ভিজে সপসপ করছিল, সে হাতজোড় করে বলল, মার্জনা করবেন। এই গোবুফে গ্রামে বিয়ে করবার বাসনা আমার মিটে গেছে। কিন্তু শুধু বলছিলাম, সেই মেয়েটিকে একবার দেখা যায় না?

মেয়েটি? কোন্ মেয়েটি?

বর সবিনয়ে বলল, আজকের পাত্রীটি।

কী! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! অর্বাচীন বেল্লিক বর্বর! পরস্ত্রীর মুখ দেখতে চাও তুমি? সবাই এই মারে তো এই মারে।

এই সময় হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

বাইরের উঠনে যেখানে বরের আসর ছিল, সেইখানে উন্মাদিনীর মত ছুটে এলেন বীরেশ্বরী, চেলিপরা ফুলেশ্বরীকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে। কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, কারও কথা শুনো না তুমি বাবা, এই আমি আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি—তুমি ওকে নিয়ে নৌকো করে পালাও। সুতোনুটিতে গিয়ে অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে ওকে বিয়ে কর, তুমিই ওর প্রকৃত স্বামী।

হৈ-হৈ রব উঠল।

মুখুজ্জে মশাই খড়ম খুলে স্ত্রী-কন্যার দিকে ছুঁড়তে যাচ্ছিলেন, কে যেন ধরে নিবৃত্ত করল।

ফুলেশ্বরীর কাকা রব তুলে হুকুম দিল, দোরে তালাচাবি দিয়ে রেখে দাও। কে ছেড়েছে পাগলীকে! দুটোকেই দোরে চাবি দিয়ে রাখো।

দুজন দাসী এসে ওদের টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে গেল। কিন্তু ততক্ষণে রাজমোহনের মনের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। কনে দেখে নিয়েছে।

দেখে বোধ হয় ভাবল, এ কী মেয়ে! মরি মরি! এ মেয়ের জন্যে লড়াই করা যায়, মান খুইয়ে খোশামোদ করা যায়।

তা করেছিল নাকি অনেক কাকুতি-মিনুতি।

বলেছিল, ফুলগাছের সঙ্গে বিয়ে আবার বিয়ে! মিথ্যে লোকাচারের বশে আপনার এমন সর্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার জীবন একেবারে মাটি করে দেবেন না। আপনি আমার হাতে তুলে দিন।

রামতারণ বললেন, মিথ্যা লোকাচার নয়, সত্যধর্ম। এক কন্যার নামে দুবার সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ করা যায় না।

নিজের সন্তানের সুখ দুঃখ দেখবেন না?

রামতারণ বললেন, সুখ দুঃখ দেখবার মালিক কি আমি? এখন না হয় তোমার প্রস্তাবমত কাজ করলাম, ফিরতি যাত্রাপথে তুমি যে নৌকাডুবি হয়ে গঙ্গায় নিমজ্জিত হবে না, তার নিশ্চয়তা কী?

নিশ্চয়তা অবশ্য কিছুই নেই।

বর মাথা হেঁট করে বসে থাকল। কিন্তু ফুলেশ্বরীর সেই মুখ মনে করে যেন স্থির থাকতে পারছিল না। কাজেই ফের বলল, আর-একবার বিবেচনা করুন—

রামতারণ অটল অচল। বললেন, রামতারণ মুখুজ্জে কখনও এক কাজের জন্যে দুবার বিবেচনা করে না। যা করেছি ভেবে বুঝেই করেছি। আমি স্ত্রীলোক নই যে স্নেহে অন্ধ হব। আমি মেনে নিয়েছি আমার কন্যার ওই ভবিতব্য।

বর মাথা হেঁট করে ফিরে গেল লাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। বরযাত্রীদের নাকি আর গোলমাল করতে দেয় নি।

আরও শুনেছি, সত্যি মিথ্যে জানি না, দিদিমার মা নাকি গোলমালের মধ্যে লুকিয়ে মেয়েকে চেলি ছাড়িয়ে, সাদা কোরা শাড়ি পরিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন—মেয়েকে ঘাটে-বাঁধা বরের নৌকায় তুলে দিয়ে নিজে গঙ্গায় ডুবে মরবেন বলে। ফুলেশ্বরীও নাকি আপত্তি করে নি। কিংবা হয়তো করেছিল। কে জানে! কিন্তু এদের কড়া পাহারার চোখ

এড়াতে পারল না। ধরা পড়ল। তখন তাদের সত্যি চাবি দিয়ে রেখে দেওয়া হল।

তারপর আস্তে আস্তে সবাই সামলাল।

ফুলেশ্বরী সধবা গিন্নীদের সঙ্গে ভিড়ে গেল। সধবার মান মর্যাদা পেল, লোকের বিয়েয় এয়ো হল, শ্রী গড়ল, বরণডালা সাজাল, পাঁচজনের সঙ্গে আলতা সিঁদুর পরে বেড়াল—আবার আর-একদিন গন্ধরাজ গাছটা শুকিয়ে মরে যেতে, ঘাটে গিয়ে শাঁখা ভেঙে, নোয়া ফেলে, সিঁদুর মুছে, বিধবাদের দল ভারী করল।

হোপলেস! গাছ মরে গেল বলে বিধবা!—সতু হতাশভাবে বলে, এঁরাই সব ছিলেন তখনকার মহা মহা পণ্ডিত! শাস্ত্রজ্ঞ! বেদজ্ঞ! ছি-ছি!

নবদুর্গা হাসলেন: তখনকার তো সবটাই ছি-ছি! নইলে জলজ্যান্ত গাছটা, নিত্য যার পায়ে জল ঢালে ফুলেশ্বরী, হঠাৎ ঝলসে পুড়ে কাঠ হয়ে গেল কেন? কাজটা—জ্ঞাতি-শত্তুরের কাজ। গাছটা মরলে মুখুজ্জে মশাই মেয়েকে বিধবা হতে দেন কি না দেখবার জন্যে জ্ঞাতিরা নাকি কোন তক্কে এসে গাছের গোড়ায় গন্ধক পুঁতে দিয়ে গিছল। ফুলন্ত গাছটা পুড়ে মোল। ফুলিরও কপাল পুড়ল।

সতু ভুরু কুঁচকে বলে, সেই বৈধব্য তিনি মানলেন?

ও মা! শোন কথা!—নবদুর্গা চোখ কপালে তোলেন: মানবে না কী? রোজ প্রাতঃকালে সেই গাছের গোড়ায় জল ঢেলে তবে জলগ্রহণ করত। স্বামীজ্ঞানে গলবস্ত্র হয়ে দু বেলা প্রণাম করত।

ছি-ছি-ছি!

তা তোরা এখন 'ছি' বললে কী হবে? যে কালের যে আচার!

আচ্ছা, তিনি সেই বাপের মুখ আর দেখেছিলেন?

এই দেখো ক্ষ্যাপার কথা! চিরটা কাল তো তিনিই তাঁর বাপের সংসার মাথায় করে রেখেছিলেন। তেমনি আবার তাঁকেও দেশসুদ্ধু লোক মাথার মণি বলে গণ্য করেছে। ফুল ঠাকরুনের ভয়ে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত।

সতু কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কল-কোলাহল করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকল ঝুমঝুমি আর বুলবুল। হৈ-হৈ করে বলে উঠল: এই সতু, তুই এখানে খোকার মত ঠাকুরমার কোলে শুয়ে আছিস? বলেছিলি যে

আমাদের পত্রিকার জন্তে তোর সেই চুল-বড় লেখক-বন্ধুর কাছ থেকে একটা গল্প আদায় করে দিবি।

সতু উঠে বসে হাই তুলে বলে, ওকে আর বলতে হবে না ছোড়দি, আমি নিজেই তোদের পত্রিকায় গল্প লিখব।

তুই? তুই লিখবি গল্প?—হেসে গড়িয়ে পড়ল ওরা।

সতু গম্ভীরভাবে বলল, হাসবার কিছু নেই। বাড়ির মধ্যেই একটি গল্পের ঝুলি আবিষ্কার করে ফেলেছি আমি। তার থেকে একটি একটি করে বার করব আর তোদের পত্রিকার পাতা ভরাব!

আহা রে! পাতা ভরানো নিয়েই সব বুঝি?

তবে আবার কী? দেখিস না দুদিন পরেই এই সতু বাঁড়ুজ্জের কী নামখানা হয়!

॥ দৃষ্টিলোভ ॥

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন সভ্যতার প্রসার, তেমনি বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই নাকি মানুষের মূঢ়তা আর কুসংস্কারের বিনাশ। বিজ্ঞান মানুষকে শেখাচ্ছে তার বহুযুগসঞ্চিত জটপাকানো কুসংস্কারের শিকড় ছিঁড়তে।

কিন্তু মানুষ কি সত্যিই তা শিখছে?

তাই যদি শিখছে, তবে এই প্রখর বিজ্ঞানের যুগে, এই শহর কলকাতার ঘাড়ের কাছে কুসংস্কারের এক বুড়ো বট ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে এতটা জায়গা দখল করে বসে আছে কী করে? কী করে "চেতলার অধর গুণিনে"র এত পসার?

অধর যেন অতীত বর্বর যুগের একটা অধ্যায়। অথচ প্রচণ্ড তার ক্ষমতা। অধর ইচ্ছে করলে বিশ ক্রোশ দূর থেকে নাকি লোককে মারতে পারে, রাখতে পারে। অধর 'বাণ' মেরে বোবা করে দিতে পারে লোককে, পারে ফলন্ত ভরন্ত গাছকে নিমেষে ঝলসে কাঠ করে দিতে। মাতৃগর্ভস্থ শিশুর রূপ পরিবর্তন করে দেবার ক্ষমতাও নাকি আছে অধরের।

আরও অনেক গুণ আছে অধর গুণিনের। আছে অনেক শক্তি। রাক্ষসী শক্তি, পৈশাচিক শক্তি, দৈবী শক্তি, অলৌকিক শক্তি।

বিজ্ঞান যেখানে হার মানে, ভাগ্য যেখানে নিষ্ঠুরতা করে, ক্রুদ্ধ গ্রহ-নক্ষত্রেরা যেখানে হিংস্র হয়ে মানুষকে দুর্গতির পথে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়, সেইখানে হচ্ছে অধরের কর্মক্ষেত্র। মানুষের অসহায়তা আর নিরুপায়তাই অধরের পসারের মূল শিকড়।

অধর অষ্টসিদ্ধ। কামরূপ কামাখ্যার মন্ত্র। অধরের 'গুরু গোঁসাই' রতন হাড়ী নাকি মৃত্যুকালে তার এই প্রিয় শিষ্যটিকে তার নিজের আজীবন-সঞ্চিত বিদ্যার পুঁজি উজাড় করে দিয়ে গিয়েছিল। তার ওপর আছে অধরের নিজের সাধনা আর হাতযশ। অধরের ঝাড়ফুঁক অব্যর্থ, অধরের

জলপড়া তেলপড়া নাকি 'ডেকে কথা কয়', অধরের হাতচালা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের চাইতে হাজার গুণ কার্যকরী।

চুপি চুপি বলতে দোষ নেই, কত সময় পুলিসের বড়কর্তাদেরও আসতে দেখা যায় অধরের এই কাঁচা-নর্দমা-ডিঙোনো পচা বস্তির ঘরে। আর শুধুই কি পুলিসের বড়কর্তা? উকিল, ব্যারিস্টার, নাম-করা কলেজের অধ্যাপক, বিলেত-ফেরত ডাক্তার—অধরের ঘরে গতিবিধি নেই কার?

ইতরজন বা জনসাধারণ—এরা আসে দিনে দুপুরে, সকালে বিকেলে। কিন্তু এই সব বড়দরের মানুষরা প্রায়শই আসেন সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে। বড়রাস্তার মোড়ে বড় বড় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে নাকে রুমাল চেপে ধরে আস্তে আস্তে ডিঙোন কাঁচা নর্দমার এলাকাটা।

অধরকে ভাল পাড়ায় বাড়ি জুটিয়ে দেবার কথাই কি বলে নি কেউ? বলেছে বইকি, অধর রাজী হয় না। এই ঘরই নাকি তার আসল শক্তি। এখানে কামাখ্যা মায়ের সদাজাগ্রত কৃপা। অতএব ওঁদের আসতেই হয় নাকে রুমাল চেপে। দায় যে তাঁদেরই। প্রাণের দায়, মানের দায়, আর সব রকমের দায়েরই দায় বহন করে অধর।

আজও তাই সন্ধ্যার অন্ধকারে মোড়ের মাথায় বড় গাড়ি দাঁড়াল। তার থেকে সম্ভ্রান্ত চেহারার এক ভদ্রলোক নামলেন, পকেট থেকে বার করলেন রুমাল, ধীরে ধীরে বস্তি-বাড়ির ওই বিশেষ দরজাটির সামনে এসে খুটখুট করে কড়া নাড়লেন। অনুমান করা যায় ইনি নবাগত নয়।

কড়ানাড়ার শব্দে দরজা খুলে কেরোসিন কুপি হাতে বেরিয়ে এল একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক। পরনে একখানা ময়লা দুর্গন্ধ গেরুয়াশাড়ি, মাথার চুল ঝুঁটি-করে বাঁধা, হাতে দুগাছা মোটা সাদা শাঁখা। রঙটা তামাটে, মুখটা পুরুষালী। কণ্ঠেও পরুষতা।

কী চাই?

ভদ্রলোক বোধ করি একবার মাথটাও নোয়ালেন, তারপর বিনীত কণ্ঠে বললেন, আজ্ঞে, একবার গুণিন মশায়কে যদি ডেকে দেন—

স্ত্রীলোকটি এঁর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে ভুরু কুঁচকে বলে, আপনি কদিন আগে একবার এসেছিলেন না? ছেলের অসুখের জন্যে—

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা সে ছেলে এখনও টিকে আছে?—যেমন চেহারার শ্রী, তেমনি

শ্রীহীন কথা। ভদ্রলোক বিদ্রোহী মনকে বোধ করি কষ্টে সংবরণ করে বিনীত কণ্ঠে বলেন, তার জন্যেই এসেছি।

গুণিন তো বলে দেছে আপনার ছেলের 'প্রেমাই' আর নেই।—জজের রায়ের ভঙ্গিতে কথা বলে স্ত্রীলোকটা।

ভদ্রলোক মাথা হেঁট করে ব্যাকুলস্বরে বলেন, তবু একবার ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

দেখা করে আর কী হবে?—স্ত্রীলোকটি তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, গুণিন আমায় বলেছে ও-ছেলেকে বাঁচাতে হলে অন্যের প্রেমাই কেড়ে এনে ওকে দিতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই। তা সেদিন তো এ কথা শুনেই আপনি রেগে ঠর ঠর করে বেরিয়ে গেলেন!

ভদ্রলোক গলা ঝেড়ে বলেন, আমি সেই বিষয়েই কিছু বলতে চাই—

তবে দাঁড়ান, ডেকে দিচ্ছি।—মদগর্ব চালে ফের ভিতরে ঢুকে যায় স্ত্রীলোকটি, এবং অধরকে উদ্দেশ করে বলে, নাও, এখন ওঠ। সেদিনের সেই বড়মানুষটা আবার আজ এসেছে।

কোন্ বড়মানুষটা রে কীরি?—লাল ছালটির চাদরটা গায়ে দিতে দিতে অধর বলে, কত বড়মানুষই তো আসে।

সেই যে—যে লোকটা ছেলে মরছে বলে ছুটে এসেছিল, 'নিশি' ডেকে অন্যের প্রেমাই নেবার কথা শুনে রেগে বেরিয়ে গেল!

গুণিন বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, জানতাম আবার আসতে হবে বাছাধনকে। প্রাণের দায় বড় দায়। তা বাবুরা তো মান খুইয়ে সময় থাকতে আসবেন না, যখন নিজের কাল উপস্থিত হবে, হালে পানি পাবেন না, তখন এই অধরকে শরণ! যাই, কী বলে শুনি গে।

কেরোসিনের কুপিটা কীরির হাত থেকে নিয়ে বেরিয়ে আসে অধর, আর সেই ধোঁয়া-ওড়া লালচে আলোয় তার বীভৎস চেহারাটা আরও বীভৎস দেখায়।

কপালে কালচে লাল প্রকাণ্ড একটা রক্তচন্দনের ফোঁটা, জটাপড়া লাল লাল ঝাঁকড়া চুলে ভর্তি মাথা, চোখ দুটো গাঁজার প্রভাবে আরও কড়া লাল। পরনে একখানা টকটকে লাল থেঁটে ছালটির ধুতি, বাঁ হাতের কনুইয়ের ওপর একগাছা ঝকঝকে লাল মোটা তামার তাগা।

এই রক্তাক্ত পটভূমিকার মধ্যে অধরের চেহারাটা যদি দশাসই আর রঙটা

কটা হত, তা হলে হয়তো সেই 'কাপালিক মূর্তি' দেখে একটা ভয়মিশ্রিত সমীহ ভাব মনে আসত। কিন্তু চেহারাটা তার একেবারে উল্টো।

পোড়া কয়লার মত কালো খসখসে রঙ, দড়ি পাকানো, রোগা পাকসিটে গড়ন, মুখখানা পেশীতে আর রেখাতে কদর্য। তাই চেহারাটা দেখলে গা-ঘিনঘিন করে ওঠে। এর ওপর যখন গাঁজার কাশির দাপটে হাড়-জিরজিরে বুকটা অধরের তোলপাড় করতে থাকে, মনে হয় গেল বুঝি এখনি ফেটে চৌচির হয়ে। কিন্তু হয় না কিছুই। শুধু দেখতে দেখতে দর্শকের মনটা আরও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে।

তবু লোকে পায়ের ওপর হুমড়ে পড়ে, বাবা বলে দু হাত জোড় করে।

ইনিও করলেন। পঁচিশ হাজার টাকার গাড়ি থেকে নেমে-আসা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, বাবা, ছেলেটাকে রক্ষে করবেন না?

বোস্, বোস্।—অধর গুণিন সকলের পূজ্যপাদ। তাই বেশী ভদ্রলোকদের 'তুই', আর সাধারণ লোকদের 'হারামজাদা' ছাড়া সম্বোধন করে না।

বসবার জায়গার মধ্যে মেটে দাওয়ার ওপর ছড়ানো দু-তিনটে ছেঁড়া বেতের মোড়া। ভদ্রলোক তারই একটায় সঙ্কুচিত হয়ে বসে বলেন, আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম।

অধর ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে বলে, আসবেন বইকি বাবু, কথায় বলে পুত্তুর সন্তান। তাও আবার এক মাত্তর সন্তান। শিবরাত্তিরের সলতে। কিন্তু করব কী বলেন? ব্যামোটিও যে শিবের অসাধ্যি। দেখেছি তো সেদিন গুনে—অধর যেন মস্ত একটা ঘোষণা করছে, ছেলের আপনার পরমায়ু নেই।

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন বাঁচাতে পারেন।

অধরের লাল লাল চোখ দুটো অন্ধকারে জলে ওঠে।

গলা ঝেড়ে নিয়ে বলে, পারব না কেন, হাজার বার পারি। কিন্তু বাবু মশাই, তাতে তো আপনি রাজী হলেন না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে সহসা কাতরস্বরে মনের কথা খুলে বলেন, সেদিন হঠাৎ শুনে মনটা একটু বিচলিত হয়ে গিয়েছিল, তাই চলে গেলাম। এদিকে ছেলের মা পাগলের মত হয়ে গেছে, সে নিজেই আপনার কাছে আসতে চাইছিল। এক সন্তান—। ভদ্রলোক একটু চুপ করলেন, বোধ হয় চোখের জল ঝরে পড়বার লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করতে। একটু চুপ করে থেকে আবেগভরা কণ্ঠে হাত জোড় করে বলেন, লাখ টাকার বদলেও যদি

আমার ছেলের প্রাণটা ফিরিয়ে দিতে পারেন গুণিন ঠাকুর, আমি তাই দেব। হীরের টুকরো ছেলে আমার, একটা পাস করলেই বিলেত পাঠাব, কত আশা! কত স্বপ্ন! সব ধ্বংস হয়ে গেল! ছেলে গেলে আমার স্ত্রী পাগল হয়ে যাবেন। আর আমিই বা—আবার একটু থামলেন ভদ্রলোক, তারপর ফের বললেন, ব্যাঙ্কে আমার পাঁচ লাখ টাকা, কলকাতায় তিনখানা বাড়ি, এসবে কী হবে যদি ছেলেই চলে যায়? আপনি আমার সর্বস্ব নিন, শুধু ওকে বাঁচিয়ে দিন।

অধর একটু চুপ করে থেকে স্বভাববহির্ভূত কোমল কণ্ঠে বলে, টাকায় কিছু হবে না বাবু, সে তো আমি বলেছি আপনাকে, পরমায়ু চাই। কোন জলজ্যান্ত মানুষের পরমায়ু। তবে হ্যাঁ, আমার দক্ষিণা যা দিতে চান দেবেন।

তবে তাই যা হয় করুন।— ভদ্রলোক নিজেও পাগলের মতই বলে ওঠেন, পাপ পুণ্য ধর্ম অধর্ম ওসব কোন বোধই আর এখন নেই আমার। যত দক্ষিণা চান দেব, শুধু আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

বেশ, তাই করব।—অধর মহোৎসাহে বলে, ডাবের জন্যে স পাঁচ আনা পয়সা তা হলে দিয়ে যান। ওটা আপনাকেই দিতে হবে কিনা। আর— অধর বাজারদর আলোচনার মত সহজভাবে বলে, আপনার যদি কোন শত্রু থাকে তো নাম করুন না বাবু, এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে।

তার মানে?—ভদ্রলোক চমকে ওঠেন।

মানে?—অধর ফ্যাক ফ্যাক করে হেসে ওঠে: বাবু যেন শিশু মাত্তর। বলছি আপনার কোন শত্তুরের নাম ঠিকানা পেলে, ওই ডাবের মুখ কেটে আড়াই পহর রাতে তার বাড়ির আনাচ-কানাচ থেকে নাম ধরে ডাক দেব। সাড়া দেওয়া মাত্তর ডাবের মুখ চাপা, বাস্, তার পরমায়ুটি চলে আসবে ডাবের মধ্যে, সেই ডাবের জলটি তৎক্ষণাৎ খাইয়ে দিলেই ছেলে আপনার নির্ঘ্যাস বেঁচে যাবে। ছেলেও বাঁচল, শত্তুরও নিপাত হল। তাই বলছি—এক ঢিলে দুই পাখি।

আগেও এ কথা হয়ে গেছে। এতটা প্রাঞ্জল না হোক, প্রাণের বদলে প্রাণের কথা হয়েছিল। সেদিন ভদ্রলোক এই ভয়ঙ্কর বীভৎস প্রস্তাবটা সহ্য করতে পারেন নি, অধরকে তাঁর পিশাচ মনে হয়েছিল। পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থা আরও শোচনীয়। ডাক্তারে হাল ছেড়ে দিয়ে গেছে, স্ত্রী

প্রায় উন্মাদিনী, তাই ধৈর্য ধরে শুনলেন সবটা। তারপর হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, না, আমার কোনও শত্রু নেই।

শত্তুর নেই? তাজ্জব দেখেন দিব্বি ভাল মানুষের ছেলের কী বিপদ! আচ্ছা, ও আমিই ব্যবস্থা করে নেব। মুশকিল একটু আছে, ভিন্‌পাড়ায় যেতে হবে। এ তল্লাটে কাউকে নিশিতে ডাকলে, পাঁচজনে এসে এই অধরকেই 'সোবে' করবে।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে সেই ছোট দাওয়াটাতেই পায়চারি করতে থাকেন, তারপর স্খলিত স্বরে বলে ওঠেন, এ রকম আপনি আর কখনও করেছেন?

তা করেছি বটে বাবু। তখন নতুন নতুন। অন্যত্র থাকতাম, গুরুদেবের শিক্ষে ঠিক মতন প্রেয়োগ করতে পারলাম কি না পরীক্ষে করতে করেছিলাম দুবার।

শুধু শুধু?—শিউরে ওঠেন ভদ্রলোক।

শুধু শুধু কেন বাবু, বললাম যে বিদ্যের পরীক্ষে করতে। একবার একটা গরিব বামুনের ছেলের ওপর, আর-একবার একটা বাগদীদের ছেলের উপর বিদ্যে প্রেয়োগ করলাম।

ভদ্রলোক যেন অন্ধকারের পাথারে ডুবে যাচ্ছেন: তারা মারা গেল?

তা যাবে না?—অধর সোৎসাহে বলে, এ কি যে-সে গুরুর শিক্ষে?

ভদ্রলোক একটা হতাশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, থাক্ গুণিন মশাই, ওতে আর কাজ নেই, ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে। আমার আবারও আসাটাই ভুল হয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, বাপের প্রাণ। যাক, এই সামান্য কিছু প্রণামী, আপনার ঠাকুরের কাছে আমার কথা জানাবেন, তাতেই যদি কিছু সুফল হয়। নইলে ভগবানের বিধান মেনেই নিতে হবে। নমস্কার।

ভদ্রলোক দাওয়া থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, নাকে রুমাল চাপতে ভুলে।

ভদ্রলোক চলে যেতেই ভিতর-বাড়ি থেকে ক্ষীরি মুখ বাড়াল। বলল, দিলি তো লোকটাকে বিগড়ে?

অধর যত বড় গুণিনই হোক, ক্ষীরি তাকে আরও এক প্রচণ্ড মন্ত্রে চির-কালের মত গুণ করে রেখেছে। তাই সকলের পূজ্যপাদ অধরকে 'তুই তোকারি' করতে তার বাধে না। অধর অপ্রতিভভাবে বলে, আমি আর

কী বিগড়োব, দেখছিস তো লোকটার মনে কিছুতেই সায় নিচ্ছে না। প্রাণের জ্বালায় ছুটে এসেছিল, আবার বিবেক ধরল।

বিবেক ধরল!—ক্ষীরি বাগদিনী মুখটা কুশ্রী করে বলে, শুধু বাবুর কেন, তোরও তো বিবেক ধরল! নইলে অত ব্যাখ্যানা করে বোঝাবার কী কাজ ছিল? বললেই পারতিস 'মায়ের নামে ক্রিয়াকাণ্ড করে ছেলে বাঁচিয়ে দেব।' তারপর তোর কাজ তুই করতিস। ছেলে বাঁচলে বাবু তোকে কোন্ না পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দিত?

তা দিত, লাখ টাকা দিতে চাইছিল। বলছিল, ব্যাঙ্কে পাঁচ লাখ টাকা, তিনখানা বাড়ি, ছেলে গেলে কে ভোগ করবে?

ও হতভাগা মুখপোড়া নির্বুদ্ধির ঢেঁকি! যা, এখুনি যা, দেখ্‌গে হয়তো এখনও বাবু এ তল্লাট ছেড়ে যায় নি। ধর্‌গে যা। মিছে করে বল্‌গে যা, কারু প্রাণ হানি করব না; 'তান্‌তিরিক্' ক্রিয়া করব, ছেলে বাঁচলে পাঁচটি হাজার দিতে হবে; কথার খেলাপে ছেলের আবার মিত্যু। যা, ছুটে যা। ধম্মজ্ঞান হয়েছে! বিবেক ধরেছে! এ বিদ্যে তবে শিখেছিলি কেন?

শিখেছি মা-চণ্ডীর নিদ্দেশে। কিন্তু প্রাণ কারুর হানি করতেই হবে ক্ষীরি। এ কাজের এই নিয়ম। তাই চিন্তায় পড়েছি। তুই ঠিকই বলেছিস, বাবুর বিবেক দেখেই এই চিন্তাটা মনে উদয় হচ্ছে। একজনের প্রাণ বাঁচাতে আর-একটা প্রাণ—

থাম্ তুই।—ক্ষীরি খিঁচিয়ে ওঠে: সব প্রাণের দর সমান নাকি? রাস্তার শ্যাল-কুকুরের অধম প্রাণও আছে, আবার ওই বাবুর এক সন্তানের মত দামী প্রাণও আছে। ওদের বাঁচালে শ্যাল কুকুর মারার পাপের হককে অনেক পুণ্যি।

অধর হঠাৎ কেমন বিহ্বলের মত তাকায়। তারপর বলে, তুই ঠিক বলছিস ক্ষীরি, পাপ নেই? পুণ্যি আছে?

বলব না কেন!—ক্ষীরি বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলে, যা বলছি ঠিকই বলছি। কিন্তুক, বাবু যে এতক্ষণে হাওয়া-গাড়ি চেপে হাওয়া হল। তোর বুদ্ধিতে গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

আর চড়াতে হবে না, বাবুর বাড়ি আমার জানা, ঘুরে আসছি।—বলে অধর দাওয়া থেকে নেমে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ক্ষীরি কপাটটায় খিল লাগিয়ে ঘুরে ঢুকে আসে। এসেই রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় ওর। দেখে, ঘরের মধ্যে পোষা বেরালটা ঢাকা-চাপা ঠেলে মাছের তরকারিটা গপ গপ করে খাচ্ছে আর দশ-এগারো বছরের ধাড়ী ছেলেটা দিব্যি চৌকিতে বসে পা দোলাচ্ছে। যেন ভারি একটা মজা হচ্ছে!

ও মুখপুড়ী, তোর এই কাজ!—বলে পোষা বেড়ালটাকে এক লাথি মেরে ঘরের বার করে দিয়ে ছেলেটার কান ধরে ক্ষীরি: হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, বসে বসে মজা দেখছিস? মর্ মর্, এখুনি মর্, যমের অরুচি। এখন কী দিয়ে ওই ভাতের পিণ্ডি গেলা হবে?

ছেলেটা আঁ-আঁ করে কেঁদে ওঠে।

ক্ষীরি দুমদাম করে বাসনপত্র সরাতে থাকে। এই এক আবোড় ছেলে। কোন যদি বুদ্ধি আছে! লোকের কাছে পরিচয় ক্ষীরির বোনপো, ক্ষীরিকে 'মাসী' বলেই ডাকে ছেলেটা। কিন্তু ক্ষীরির খুব যারা অন্তরঙ্গ, তারা জানে ইতিহাস অন্য। কিন্তু ও-কথা থাক্। গুরুর আদেশে ভৈরবী নিয়ে শক্তিসাধনা করতে হয় অধরকে, নইলে মন্ত্র ফলে না।

অনেক রাত্রে ফিরল অধর।

ক্ষীরি বলল, এত রাত অবধি কী করছিলি সেখানে?

সেখানে করি নি কিছু। রাস্তায় ঘুরছিলাম।

আ মরণ! গাঁজার দমটা বুঝি বেশী চড়ে গেছল! নে, এখন গিলে নিয়ে আমায় ছুটি দে।

আজ আর খাব না।—বলতে বলতে অধর চাদরের আড়াল থেকে কী একটা লুকিয়ে চৌকির তলায় রাখে। কিন্তু ক্ষীরির শ্যেন দৃষ্টি।

কী রে মুখপোড়া, আজ আবার বুঝি বোতল এনেছিস? তাই রাস্তায় ঘোরার ছুতো! আবার আমার চোখ আড়াল করছিস? আমায় না দিয়ে খাবি?

বোতল নয়, বোতল নয়। হাত দিস নি তুই।—অধর বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মরণ!—ক্ষীরি বলে, ডাব এনেছিস! তা বললেই হত! রুগীর অবস্থা বুঝি শেষ অবস্থা? আজ রাত্তিরেই ক্রিয়ে করবি! তা ভাগ্যি গুনে আজ মঙ্গলবারও পড়েছে। তা হলে তুই তো খাবি নে? নিশা-উপুসী না থাকলে তো আর হবে না।

মাছের অভাবে, বোতল থেকে খানিকটা আচার বার করে নিজে গুছিয়ে খেতে বসে ক্ষীরি। তারপর ছেলেটাকে ডেকে মায়ে পোয়ে খেতে বসে। তিন জনের ভাত দুজনে খেয়ে নিতে অবশ্য বাধে না। তবে ন্যালা-ক্ষ্যাপা ছেলেটা খেয়ে উঠে আর যেন নড়তে চায় না। জিভ এড়িয়ে এড়িয়ে বলে, পেট নিয়ে আর উঠতে পাচ্ছি না মা। রেতের মধ্যে নিঘ্‌ঘাত পেট ফেটে মরে যাব।

ক্ষীরি ধমকে ওঠে: হাড়হাবাতে ছেলের কথার ছিরি দেখ! আগে বললি নে কেন? তা হলে আমি আর দুটো নিতাম।

অধর খেল না বলে খুব যে দুঃখিত ক্ষীরি, এমন মনে হল না।

কিন্তু কে জানত—সকালবেলা উঠেই এমন দাপাদাপি শুরু করবে ক্ষীরি!

বস্তিসুদ্ধ লোক ছুটে আসে ক্ষীরির চিৎকারে: হল কী! হল কী!

কিন্তু হল কী, সে কথা বলবে কে? ক্ষীরি যে পাগল হয়ে গেছে।

অধর গুণিনকে মেরে, লাথিয়ে, চুল টেনে যেন ছিঁড়ে-খুঁড়ে ফেলেছে উন্মাদিনী ক্ষীরি।

কিন্তু অধরের কী দোষ?

বস্তিসুদ্ধ লোক সেই কথাই বলে, অধরের কী দোষ? তোর বোনপোর পরমাই ফুইরে ছেল তাই মরেছে। নইলে জলজীয়ন্ত ছেলেটা খেয়ে শুয়ে ছিল, আর মরে কাঠ হয়ে থাকে!

যারা কিছু পণ্ডিত তারা বলল, একেই ডাক্তার-বদ্যিরা বলে হার্টফেল। ও একটা আচমকা রোগ। আহা, শোক তো লাগবেই, বুনপোটাকে মানুষ করেছে হাতে করে। তায় আবার অবোলা অবোধ মতন ছেলে।

অধরকে ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয় লোকে।

কিন্তু বোনপোর শোকে বোধ করি সত্যিই পাগল হয়ে গেছে ক্ষীরি। তাই সম্পূর্ণ অর্থহীন চিৎকার করতে থাকে, ওরে হারামজাদা লক্ষীছাড়া, পয়সার লোভে তুই আপন সন্তানকে মারলি? ওরে, নরকেও যে গতি হবে না তোর। এই তোর মনে ছিল? তাই বুঝি 'মেসো' বলতে শিখিয়েছিলি? লুকোচুরি, ছলচাতুরি সব ফাঁস করছি তোর। আজ দশে ধম্মে জানুক তুই তার বাপ ছিলি কি না! বাপ হয়ে তুই পয়সার লোভে ছেলে খুন করলি? ওরে, আমি কী করব রে! পিথিবীতে কেউ কখনও এমন শুনেছে? ওরে, পয়সাটাই তোর এত বড় হল?

প্রহারজর্জরিত অধর এতক্ষণ বসে বসে ধুঁকছিল, এবার হঠাৎ পাগলের মত চেঁচিয়ে ওঠে, পয়সা-পয়সা করিস না বলছি ক্ষীরি, তা হলে তোকেও শেষ করে ফাঁসি যাব। পয়সা আমি নেব নাকি? বাবুকে আমি কিছু বলি নাই, মায়ের পেসাদী ভাব বলে দিয়ে এসেছি।

পয়সা নিবি না? পয়সা নিবি না?

একটা হিংস্র জন্তুর মতন হাঁফাতে থাকে ক্ষীরি: আমাকে তুই ন্যাকা বোঝাতে এসেছিস?

অধর গম্ভীরভাবে বলে, সে তোর যা মন হয় বল্। গুরু জানে, পয়সা নিয়েছি কিনা!

ওরে সব্বনেশে, সত্যিই তবে পয়সা নিস নি? তবে কি ওই বাবুই তোকে 'গুণ-তুক' করল?

অধর লাল ছালতির চাদরের কোণ দিয়ে নাক-থেকে-গড়িয়ে-পড়া রক্তটা মুছতে মুছতে বলে, বাবু কিছু করে নাই ক্ষীরি, তুই-ই কাল আমার চোখ খুলে দিয়েছিস। তোকে আমি প্রেণাম করব, তুই আমার শিক্ষে-গুরু।

॥ অসাবধান ॥

এইমাত্র লীলা মাসীমা বিদায় নিলেন।

বিগত তিনটি দিন তিনি এখানে অবস্থান করেছেন এবং চির প্রথানুযায়ী ভগিনীপুত্রের পকেট শোষণ ও তস্য বধূর 'অস্থিদাহন'রূপ মহৎ কর্মটি পরিপাটীভাবে সমাধা করেই বিদায় নিয়েছেন। তবু বিদায়পর্ব মিটিয়ে এসেই গৃহিণী যখন প্রায় ফেটে পড়ে বলে উঠলেন, 'উঃ, গত জন্মে কত ধার ছিল তোমার লীলা মাসীর কাছে তাই ভাবছি,' তখন কিন্তু হাতের ইশারায়' তাঁকে নিবৃত্ত হবারই অনুরোধ জানালাম।

অর্থাৎ থাক্, কোনও মন্তব্য নয়।

হ্যাঁ, সঙ্কল্প করেছি কারও বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য আর করব না। কেন সঙ্কল্প করেছিলাম, সেটাও নতুন করে মনে পড়ে গেল।

গৃহিণী অবশ্য আমার এই ভাব-পরিবর্তনে সুখী হলেন না, বেশ কিছুক্ষণের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই তিন দিনের পুঞ্জীভূত হৃদয়-উত্তাপ কিছুটা শীতল করে নেবার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু এ-হেন স্পষ্ট নিষেধে আহত হয়ে গেলেন। অবশ্য আহত হয়ে চুপ করে গেলেন, এ মনে করলে ভুল হবে, তিক্ত-হাসির-আমেজ-মাখানো একটি প্রশ্নবাণ সঙ্গে সঙ্গেই ছুঁড়লেন: কেন, লীলা মাসীর জন্যে মন কেমন করছে না কি?

হেসে বললাম, অসম্ভব কী? করতে পারে না?

পারবে না কেন? মহাপুরুষদের পক্ষে কী না সম্ভব!—বলে গর্ গর্ করে উঠে গেলেন।

ফিরে আর ডাকা হল না। বসে বসে ভাবতে লাগলাম, ও-সঙ্কল্পটা কেন করেছিলাম!...কেন করেছিলাম তাই বলছি—তবে সে-গল্প লীলা মাসীর নয়, জগমামার।

অনেক দিন আগের কথা সেটা।

অনেক দিনের পর হঠাৎ একদিন একটু সময় হাতে পেয়েছিলাম।

ভাবছিলাম, এই দুর্লভ বস্তুটি নিয়ে কী করা যায়! মানে, কী করলে সত্যিকার সদ্ব্যয় হয় সময়টার!

কাজের চাপে তো আত্মীয়-স্বজনের নাম ভুলে যেতে বসেছি। যে সব আত্মীয়ের বাড়িতে আগে প্রায়ই যেতাম এবং এখন আর মোটেই যাই না, তাঁদের কার বাড়ি ঘুরে আসব? একে একে অনেকগুলো বাড়ি মনে করলাম, পছন্দ হল না কোনটাই।

রমেনদার বাড়ি সব থেকে বেশী যেতাম। সে বাড়ির কথা মনে হতেই শেষ যেদিন গিয়েছিলাম মনে পড়ে গেল সে কথা। বউদি বিশ্রী রকমের বুড়িয়ে গেছেন, ছেলেমেয়েগুলো বড় হয়ে গেছে, কথাই কওয়া গেল না কারও সঙ্গে। আর রমেনদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা প্রশ্নের টোপ ফেলে ফেলে ক্রমাগত জানতে চেষ্টা করলেন, আজকাল কত রোজগার করছি আমি! এ ছাড়া যেন আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার আর-কিছুই নেই।

ছেলেবেলা থেকে ক্যামেরার শখ ছিল। সেই শখের সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আর অনেক ঘাটের জল খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত পরিণত হয়েছি সিনেমার ক্যামেরাম্যানে। কাজ কখনও থাকে, কখনও থাকে না, অবশ্য যখন কাজ থাকে না তখনই ব্যস্ত থাকি বেশী।

সে যাই হোক, ক্যামেরাম্যানের পদ পাওয়া পর্যন্ত আত্মীয়বর্গের ধারণা জন্মেছে—আমি বোধ হয় 'লাল' হয়ে গেছি। কারণ সিনেমা-লাইন সম্বন্ধে ওঁরা আর-কিছু জানুন আর না-জানুন, ও-লাইনে যে পয়সা জিনিসটা ছড়ানো থাকে এটা সকলেই জানেন। কাজেই আমার ব্যাপারে কৌতূহলের আর শেষ নেই ওঁদের। দেখা হলে সাধারণ কুশলবার্তা অথবা আমার স্ত্রী-পুত্রের খবর জানতে কেউ চান না, প্রথম প্রশ্ন আসে, নতুন কী তুলছ? পরবর্তী প্রশ্ন, কত পাবে এতে?

দূর ছাই, রমেনদার বাড়ি আর যায় না।

বীণা মাসীমা, নতুন কাকী, বসন্ত মামা, সত্যহরি, অবনী—সবাইকে মনে করলাম। নাঃ, ওঁরা আবার সিনেমার পাস পান না বলে তেমন প্রাণ খুলে কথাই বলেন না। কলকাতা শহরে যত ছবি উঠছে, তার সব ছবিই বিনি পয়সায় দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব কি না, সে তাঁদের বোঝানো যায় নি।

হঠাৎ মনে হল আত্মীয়দের যে নাম ভুলে যেতে বসেছি সে কি শুধুই সময়ের অভাবে? না, মানসিক অসদ্ভাবে?

তা হলে কি দক্ষিণেশ্বর ঘুরে আসব, কিংবা বেলুড়? অথবা—

হঠাৎ সীতানাথ এসে জানান দিল, বাবু, একটা বুড়ো মতন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।

মাথায় হাত দিয়ে পড়লাম।

বাস্, হয়ে গেল!

হঠাৎ-পাওয়া সময়টুকুকে হত্যা করবার জন্যে পয়সা খরচ করে আর যেতে হবে না কোথাও। সময়ের যমদূত এসেই গেছে। সিনেমা-লাইনে ঢুকে পর্যন্ত 'দেখা করতে' আসার লোকের অপ্রতুল ঘটে নি। এসব উদ্দেশ্যমূলক দেখা করা। তার উপর আছে তাড়া তাড়া চিঠি। সে-চিঠির ভাষা দেখলে অনেক বড় বড় সাহিত্যিকও ঈর্ষান্বিত হতে পারেন। 'জীবনে একবারের জন্যেও যদি পর্দায় আত্মপ্রকাশ করতে পাই, তা হলে হাসতে হাসতে আত্মহত্যা করতে পারি'—এমন চিঠিরও অভাব নেই। আবার অনেকে অন্তত একটা চান্স্ না দিলে আত্মহত্যার ভয়ও দেখান।

তা ছাড়া বাড়িতে এসে 'হত্যে' দেওয়া, সে তো আছেই।

অনেক দুঃখের মূল্যে এই অভিজ্ঞতাটি সঞ্চয় করেছি, বাংলা দেশের তরুণ-তরুণীর হৃদয়ে কাম্য স্বর্গ যদি কিছু থাকে তো সে হচ্ছে সিনেমার পর্দা। সে ভাবটা কেউ প্রকাশ করে, কেউ বা করে না।

বুড়ো-হাবড়াও আসে অবিশ্যি।

দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত জীবনে-অসফল অনেক বুড়ো লোক আসেন। এবং আমার যে যত-ইচ্ছে চাকরি দেবার ক্ষমতা নেই সে-কথা বিশ্বাস না করে কাকুতি-মিনতি করে অস্থির করে তোলেন।

সীতানাথের সংবাদ-পরিবেষণে বুঝলাম, তেমনি কেউ এসে হাজির হলেন। গলা খাটো করে বললাম, বললি না কেন, বাবু বাড়ি নেই?

আজ্ঞে বাবু, মিথ্যে কথাটা কেমন মুখে আসে না।

ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, বলগে যা, কী চাই?

বলেছিলাম বাবু। বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কৃতার্থ হলাম। শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল একেবারে!···যা, নিয়ে আয় এখানে।

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে উচ্চারিত হল, ডাকার অপেক্ষা আর রাখলাম বাবা, এসেই পড়লাম।

এ যে রীতিমত আত্মীয়তার সুর! চমকে উঠে বুড়ো ভদ্রলোকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে সবিস্ময়ে বলি, জগমামা নাকি?

চিনতে পেরেছ তা হলে? তোমার চাকর ব্যাটা যা সওয়াল করছিল, ভাবলাম দোর থেকেই ফিরতে হয় বুঝি। তোমার চাকরবাকরগুলো—বুঝলে বাবা, অত্যন্ত বদ।

বললাম, বাকর আর কই জগমামা, ওই একটাই তো।

আহা, তাই না হয় হল, তবে শিক্ষা ভাল দিতে পার নি বাপু।...যাক, বাড়িটা তা হলে খুঁজে বার করা গেছে।

বললাম, তাই বটে। ঠিকানা পেলেন কোথা?

আরে বাবা, তুমি এখন একটা নামজাদা লোক, চেষ্টা করলে পাওয়া যাবে না, এ কী হয়?...ওরে এই, তোর নাম কী? এক গেলাস জল খাওয়া দিকিন?

নিজেকে নামজাদা লোক বলে গণ্য হতে শুনলে পুলকিত হওয়াই স্বাভাবিক। মিথ্যে জানলেও খুশী না হয়ে উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে জগমামাকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হয় নি। দূরসম্পর্কের হলেও মামা তো বটে, বিশেষ করে যে মামা এখনও আমার সম্বন্ধে সচেতন। আর কতদিন পরে দেখা! প্রায় তো চিনতেই পারছিলাম না।

বললাম, মামা, দাঁড়িয়েই রইলেন? বসুন বসুন, তার পর আছেন কেমন?

আর থাকা থাকি! তুমি কেমন আছ তাই বল?

চলে যাচ্ছে একরকম? কতদিন পরে দেখা বলুন তো মামা?

তা হল গিয়ে তোমার—বছর বাইশ।

বা-ই-শ!

সত্যিই চমকে উঠলাম। এতটা আবার ভাবি নি।

জগমামা বললেন, তা হবে না কেন? তোর মা মারা গেল উনিশ শো তেত্রিশে, তার পর একবার মাত্র এসেছিলাম তোদের সেই সিগদের-বাগানের বাড়িতে। বাস্, আর দেখা হল কবে?

দেখলাম, জগমামার পুরনো সেই অভ্যাসটি ঠিক আছে। কথা কইলেই সাল তারিখের উল্লেখ।

আপ্যায়নের ত্রুটি রাখি না—একথা সেকথার পর ঘোষণা করি, না-খেয়ে যেতে পাবেন না মামা, দুটো ঝোলভাত এখানেই খেয়ে নিন।

জগমামা হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, থাক্ থাক্, আজ থাক্। সে আর-একদিন হবে অমল, আজ বরং ইয়ে—মানে, আজ আমি অন্য একটা দরকারে এসেছিলাম।

দরকার!

দরকার শুনেই মনটা বিগড়ে গেল।

মহৎ মহৎ ব্যক্তিদের যায় কিনা জানি না, আমার কিন্তু যায়। কেউ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়াতে এসেছে দেখলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু সাধারণত যে দরকারের দরকারে লোকে বাইশ বছর পরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দূরসম্পর্কের নামজাদা আত্মীয়ের বাড়ি আসে, জগমামার তো সে দরকার থাকার কথা নয়। দেখা-সাক্ষাৎ না থাকলেও খবর জানি কিছু কিছু। দুই ছেলে ওঁর বেশ কৃতী হয়েছে, শিবপুরে না কোথায় যেন বাড়িও করেছে একখানা।

কোন প্রশ্ন না করে তাকিয়ে থাকলাম। জগমামা একটু উসখুস, ইতস্তত করে হঠাৎ বলে উঠলেন, আমার একটা জীবনী লিখেছি।

জীবনী!

তিন অক্ষরের এই কথাটুকু মাত্র উচ্চারণ করে আরও নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে থাকি।

জগমামা এবার যেন বেশ একটু দৃঢ় হয়ে বসেন এবং একটু ক্ষুব্ধ হাসির সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ, কথাটা শুনতে পাগলের মতই বটে, কিন্তু লিখেছি আমি—নভেলের ছাঁচে লিখেছি।

মনে হল স্বপ্ন-ভাষণ শুনছি।

তাকিয়ে দেখলাম জগমামার দিকে। পরনে খাটো মোটা-খোলের থান, গায়ে গলাবন্ধ একটি কোট, তার উপর ক্লাইভের আমলের একখানা রোঁয়া-ওঠা জরাজীর্ণ মটকার চাদর। মাথার সঙ্গে শক্ত হয়ে গেঁথে বসা প্রায় সম্পূর্ণ পাকা ঘন ছোট ছোট চুল, খোঁচা খোঁচা পাকা গোঁফ দাড়ি।

এই জগমামা।

পুরনো আমলের কথাও মনে পড়ল। রঙ-ওঠা আধ ইকি পাড়ের মোটা

লংক্লথের খেঁটে পাঞ্জাবি-পরা তার সঙ্গে বেদম বাজে বক বক আর প্রচুর খাওয়া।

হ্যাঁ, সাংঘাতিক রকমের খেতে পারতেন জগমামা। আস্ত কাঁঠাল খেতেন, খেতেন আস্ত ছাগল। কুম্ভকর্ণের সঙ্গে তুলনা করা হত জগমামার!

সেই জগমামা।

'সেই' আর 'এই'! ছুটোয় যোগ করলাম, কোন রকমেই যোগফল মেলাতে পারলাম না।

আত্মজীবনী লেখার ব্যাধিটা কি তা হলে কলেরা-বসন্তের মত সংক্রামক হয়ে উঠেছে? পাত্রাপাত্র মানছে না? আচ্ছা, নাই মানুক, জগমামাও আত্মজীবনী লিখুন, কিন্তু সেই মূল্যবান খবরটি বাইশ বছরের অদেখা ভাগ্নের বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসে জানাবার তাৎপর্য কী?

প্রশ্ন করব না প্রতিজ্ঞা করে খালি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকি। ক্রমশ তাৎপর্য পাই। পেয়ে হাঁ হয়ে যাই, হাঁ করে থাকি।

খানিকক্ষণ কী কতকগুলো কথা আউড়ে জগমামা বললেন, এই জন্যেই তোমার কাছে আসা বাবা। আমার এই জীবনীখানা নিয়ে তুমি সিনেমা কর।

অ্যাঁ!

চমকাচ্ছ বটে, কিন্তু পড়ে দেখো তুমি, কেউ ধরতে পারবে না সত্যিকার কাহিনী বলে। লিখেছি যে সন্ত নভেলের মত করে কিনা। পড়লে বুঝবে। আমার এই জীবনটাই বুঝলে অমল, একখানা বিরাট উপন্যাস।

জগমামার জীবনটা একটা উপন্যাস! কালে কালে আরও কত দেখতে হবে তাই ভাবছি।

এতক্ষণ ধরে শুনলাম তবু যেন নতুন করে হতাশ হয়ে বললাম, জীবনীখানাকে সিনেমা করতে বলছেন?

হ্যাঁ বাবা, এতক্ষণ তাই তো বোঝালাম। আমি তোমার মামীকে আর তাঁর সুপুত্তুর ছুটিকে বুঝিয়ে দিতে চাই, তাদের ব্যাভারটা কী! নিজের চোখে প্রত্যক্ষ দেখুক। দেখে চৈতন্য হোক।

মুখে আসছিল—চৈতন্য অত সস্তা নয়, কিন্তু বললাম না। বললাম, -কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে?

হবে না মানে?—জগমামা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন: ঠিক না হল তো

বয়েই গেল আমার। বুঝুক না সবাই। তাই তো চাই। কাউকে রেয়াত করি নি আমি। সবাইয়ের চরিত্র রেখেছি এতে। আমার গুণধর ভাইদের, পাজীর পা-ঝাড়া শালা ছুটোর, বিচ্ছুর অবতার নাতিটার। এক ধার থেকে সব্বাইয়ের গর্দান নিয়েছি। বুঝলে অমল, কাউকে ছেড়ে কথা কই নি। সিনেমার পর্দায় যখন বাছাধনরা সব নিজেদের দেখতে পাবেন, তখন মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বুঝবেন বুড়ো চুপ করে থাকে বলেই হাবা-বোকা নয়। মুখের ওপর কাউকে কিছু বলতে পারি না, বুঝলে? তাই বোকা হয়ে থাকি। কিন্তু কত সহ্য করা যায়? রক্ত-মাংসের শরীর তো বটে। ভেবে দেখলাম, এই হচ্ছে উচিত প্রতিশোধ। তোরা জীবনভোর আমাকে হেয় করে এলি, এইবার দেখ্ আমি তোদের কী ভাবে হেয় করি! জগতের কাছে হেয় করে ছাড়ব। দশে ধর্মে দেখবে হিন্দুনারীর মহিমা, দেখবে কলিকালের পিতৃভক্তি।

শুনতে শুনতে একটু মায়াও হল।

মনস্তত্ত্বটা বুঝতে পারছি। কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহায় মৌলিকত্ব আছে বটে। যাই হোক, কাতর বচনে আবার সেই 'কিন্তু' দিয়েই বলি, কিন্তু মামা, এসব বইটই নির্বাচন তো আমার কাজ নয়। ওসব পরিচালকের ব্যাপার। আমি কে? কিছুই না। দৃশ্যটা ভাল উঠল কি না এইটুকু বোঝা হচ্ছে আমার কাজ।

নিজেকে কীটস্য কীট বলে ঘোষণা করতেও রাজী হই।

হায়! চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

জগমামা বীরবিক্রমে বলতে থাকেন, সে তুমি বিনয়ভরে যাই বল বাবা, আমি তো আর কাঁচা ছেলে নই। বলি—ছবির মাথাটা কে? পরিচালক, না, তুমি? পরিচালক বরং না থাকলে চলে, তুমি না থাকলে চলবে? কত বড় একটা মান্যগণ্য লোক হয়েছ তুমি, এ কি আর না-জেনেই এসেছি! এটুকু তোমাকে করতেই হবে অমল। না হলে মরে আমি শান্তি পাব না। জীবনভোর কত দুঃখ পেলাম আর কী নীরবে সহ্য করে এলাম সে-কথা জগৎকে জানিয়ে তবে মরতে চাই।

হাল ছেড়ে দিয়ে শুনতেই থাকি।

জগমামা বলেন, কালকে তা হলে ওটা নিয়ে আসব বুঝলে অমল। আজ উঠি।

আমাকে নিষ্কৃতি পেতে নিশ্বাস ফেলে বলি, আচ্ছা, আনবেন। কিন্তু খেয়ে গেলেন না—

তাতে কী? তার জন্যে কিছু দুঃখ কোর না বাবা। খাওয়া কি পালাচ্ছে? খেলেই হবে। তুমি যে আজ আমাকে কী তৃপ্তি দিলে! উঃ, লিখে পর্যন্ত কেবল ভেবেছি কাকে দিয়ে কাজটা হয়! হঠাৎ মনে পড়ে গেল তোমার কথা, মাথায় খেলে গেল—ঠিক হয়েছে। মোক্ষম জায়গাটিই ধরা গেছে। জানি তো অমল আমার কথা ঠেলতে পারবে না।

অনর্গল বলে চলেন, যেন হয়েই গেছে।

চলে যেতেই গিন্নী এসে শুধোলেন, ও বুড়োটা কে এসেছিল? গল্প আর ফুরোয় না।

ছিঃ, বুড়ো বলতে নেই। মামাশ্বশুর।

মামাশ্বশুর! মামাশ্বশুর আবার কে?

জগমামা। গল্প করেছি—মনে নেই?

হুঁ। তা উনি এসেছিলেন কী করতে?

প্রতিশোধ নিতে।

গিন্নীর চোখ গোল হয়ে ওঠে।

পরদিন ঠিকই এলেন জগমামা।

কোণে দড়িবাঁধা বিরাট এক কাগজের বোঝা নিয়ে।

এই গন্ধমাদন পর্বত আমার ঘাড়ে চাপাতে এসেছেন! এ প্রতিশোধ কার উপর! কার পাপে কার দণ্ড!

এই আনলাম।

না বলে পারলাম না, এ যে বিরাট জগমামা!

বিরাট!

জগমামা কেমন একরকম কাতর চোখে চেয়ে বলেন, তবু তো তিন ভাগই বাকী রয়ে গেছে অমল। এই এতকালের বিরাট জীবনটা, তার কতটুকুই বা লেখা যায়? চরিত্রগুলি যেন একটু এদিক ওদিক হয় না বাপু, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে।

তা তো বুঝলাম। তবে ভাবছি কাকে ধরব!

সে তুমি ঠিক লোককেই ধরবে। এই যেমন আমি ধরলাম।

বলে নির্দন্তমুখে হেসে উঠলেন জগমামা।

কিন্তু কে জানত শিবপুর থেকে ভবানীপুরে রোজ একবার করে ধরনা দিতে আসবেন জগমামা!

ওটার ব্যবস্থা হয়ে গেছে না কি অমল?

কুণ্ঠিতভাবে বলি, না মামা, এখনও কিছু করে উঠতে পারি নি।

বলা বাহুল্য, কিছু করার চেষ্টাও করি নি।

সত্যি, আমি তো আর পাগল নই।

জগমামা যেন আমাকেই সান্ত্বনা দেন, হবে, হয়ে যাবে ঠিকই। তুমি যখন লেগে-পড়ে রয়েছ। কিন্তু পড়ে তোমার কেমন লাগল তাই বল! রোজই ভাবি জিগ্যেস করব। কেমন লজ্জা লজ্জা করে! মন্দ হয় নি, কী বল?

সত্যি বলতে, একবর্ণও পড়ি নি। পড়ার কথা ভাবিও নি, এত জেরার মুখে দাঁড়াতে হবে সে খেয়াল ছিল না। কিন্তু সত্যি কথাও সব সময় বলা চলে না। তাই বললাম, খুবই ভাল লাগল। কিন্তু—মানে, ভাবছি—একেবারে ঘর-সংসারের ব্যাপার, ছবিতে ঠিক—

আন্দাজী ভাঁওতা মারি।

জগমামা হেসে বলেন, এই দেখ! আজকাল যে ঘরসংসারী গল্পই চলছে হে। একবার নামিয়ে দাও না, দেখ কী কাণ্ডটা হয়! এ তো আর টেনে-বুনে বানানো গল্প নয় অমল, এ যে একেবারে বুকের রক্ত দিয়ে লেখা।

জগমামার বুকেও যে এমন রক্ত ছিল, যাতে সের তুত্তিন কাগজ ভেজানো যায়, সে কথা কবে ভেবেছিলাম!

ভাঁওতা দিয়ে কদিন চালানো যায়!

মরিয়া হয়ে একদিন বসলাম খাতাগুলো নিয়ে। হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার। ছাড়া-ছাড়া মুক্তোর মত অক্ষর। বোধ করি কেবলমাত্র অক্ষরের গুণেই খুব খানিকটা পড়ে ফেললাম।

হায়! পড়ে হাসব, না, কাঁদব! কী ভাব! কী ভাষা! পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে একই কথা।

জগমামী যে কত হৃদয়হীন, কত নির্মম, কত ভয়ঙ্করী, তার বিশদ বর্ণনায় পাতার পর পাতা উঠেছে ভরে। একে একে ছেলেদের, ভাইদের, আরও কারও কারও চরিত্রবর্ণনাই চলছে। পাতা উল্টে চলে গেলাম শেষের দিকে। সেখানের দৃশ্য—

বাড়ির কর্তাকে যে সপরিবারে মিলে কী নির্যাতন করছে তারই দিনলিপি। সবচেয়ে শোচনীয় হচ্ছে—খেতে দিচ্ছে না।…ছেলে বলছে, 'বাড়িশুদ্ধ সকলে যা খাই বাবা একলা তাই খান।' গিন্নী বলছেন, 'তোমার ওই রাক্ষসের পেট ভরাতে গেলে আমার বাছাদের আর-কিছু থাকবে না।'

পড়ে দুঃখও হল।

আহা, খেতে কী ভালই না বাসতেন! তা ছাড়া অপমানের জ্বালাও তো কম নয়।

জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছেন, তবু মুখের ওপর রূঢ় হতে পারি না, অবিরত মিথ্যের জাল বুনে চলি। যথা—

তিনি বললেন, ওটা তা হলে দিয়ে দিয়েছ?

আমি বলি, ক—বে!

আচ্ছা, এতটা দেরি হচ্ছে কেন বল দেখি?

চিত্রনাট্য লেখার যে কত ফ্যাচাং মামা! আজ সবটা লিখল তো কালই ছিঁড়ে ফেলে নতুন করে লিখতে বসল।

তুমি অবশ্যিই তাগাদা দিচ্ছ, কেমন?

সে আর বলতে! দু বেলা।

দীর্ঘজীবী হও বাবা। আমার একটা ছেলেও যদি তোমার মতন হত!

লজ্জায় মাথা হেঁট করি। আর সেই লজ্জাতেই আবার পরদিন নতুন মিথ্যে কথা বলি। বলি, কিছু আশা পাচ্ছি—

স্যুটিং আরম্ভ হল নাকি অমল?

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে বলি, না, স্যুটিং আরম্ভ হতে একটু দেরি আছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাওয়াই মুশকিল যে!

জগমামা গুছিয়ে বসেন। বলেন, ভাল অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেসই দেবে, কী বল?

তা তো নিশ্চয়।

যাতে ভাব-টাবগুলো ভাল করে ফোটে সেদিকে তুমিও একটু লক্ষ্য রেখো। রাখবেই অবিশ্যি, বলাটাই বাহুল্য। আর ওই মাতঙ্গিনীর—মানে আর কি গিন্নীর পার্টটা যে নেবে তাকে—আচ্ছা, থাক্, এখন থাক্, আরম্ভ হোক।…আচ্ছা অমল, ওরা একেবারে ঘাবড়ে যাবে, কী বল?

চমকে বলি, কারা?

আহা, তোমার মামীটামীদের কথা বলছি।

বুঝতে পারলে যাবেন বইকি।

বুঝতে পারবে না? লাইনে লাইনে মিলে যাবে, বুঝতে পারবে না?

জগমামা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

তা হলে ঘাবড়ে একটু যাবেনই?

একটু?···এখনও যদি ওদের শরীরে ছিটেবিন্দু মনুষ্যত্ব থাকে তা হলে লজ্জায় মরমে মরে যাওয়া উচিত।

দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি করতে থাকেন জগমামা, অনেকটা চিড়িয়াখানার বন্দী বাঘের মত।

শিবপুর থেকে ভবানীপুরে আসার বিরাম নেই।

এইটা হলেই আমি শান্তিতে মরতে পারি অমল।

কী যে বলেন মামা! আপনি এখনও অনেক দিন বাঁচবেন।

থাক্ বাবা, তুমি আমায় ভালবাস, ও প্রার্থনা আর কোর না। কিন্তু বড্ড যে গড়িয়ে যাচ্ছে অমল! কী হল বল তো?

নতুন মিথ্যের অবতারণা করি।

বলি, কোম্পানির সঙ্গে পরিচালকের মনান্তর চলছে। ভাবি, তবু খানিকটা সময় পাওয়া যাবে। ততদিনেও কি ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে না জগমামার?

ক্রমশ যেন একটু হতাশ হতে থাকেন জগমামা। ছবি দেখে 'ওরা' কী হয়ে যাবে, সে আলোচনাটাও ফিকে মেরে যায়। তবু নিত্য-নিয়মে এসে নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে থাকেন চুপ করে। আর আমি ঘরে ঢুকলেই প্রশ্ন করেন, কী অমল, ওদের ঝগড়া মিটল?

আজ কিন্তু সে কথা বললেন না। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, অমল, আমি বলি কি ওটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্য কোম্পানির হাতে দিয়ে দাও। আমার শরীরের অবস্থা আর তেমন ভাল বুঝছি না। মনে হচ্ছে—আর বেশীদিন বোধ হয় নয়। তাই ভাবছি—সেই হবেই শেষ পর্যন্ত, অথচ আমি দেখতে না পেলে তোমার আর আপসোসের শেষ থাকবে না। এবার একটু উঠে-পড়ে লাগ অমল।

কী ভাবে স্তোক দিয়েছিলাম, আর কী ভাবে বিদায় করেছিলাম মনে

পড়ছে না, মনে পড়ছে—জগমামা চলে যেতেই গিন্নী এসে উঁকি দিয়েছিলেন। বললেন, বলি ব্যাপার কী? বুড়ো যে আমার বাড়ির মাটি নিল!

আর বোল না।—দরাজ গলায় বলে উঠি, পাগল করে ছাড়লেন। উঃ, মিথ্যে কথা কয়ে কয়ে জেরবার হয়ে গেলাম। ওঁর জীবনী তো ওই আমার আলমারির মাথায় পড়ে কাঁদছে। উনি এখন স্যুটিংয়ের স্বপ্ন দেখছেন! উঃ, মানুষ যে কী করে এত বোকা হয়!

কথাটা শেষ করেছিলাম কি সম্পূর্ণ শেষ করি নি, মনে নেই। শুধু মনে আছে হঠাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠে দেখেছিলাম দরজায় দাঁড়িয়ে জগমামা।

জগমামা চলে যাবার পরে ঘরের কোণে যে তাঁর ছাতাটা দাঁড় করানো ছিল তা দেখি নি।

সর্পাহতের মত তাকিয়ে থাকলাম।

নাঃ, সেই অবধি আর আসেন নি জগমামা। কিন্তু সে-চোখ আর আজ পর্যন্ত ভুলতে পারলাম না। তাকেই কি আলঙ্কারিক ভাষায় "শরাহত হরিণের দৃষ্টি" বলে? সেই চোখের কোল দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল দু ফোঁটা জল, আড়ষ্ট হয়ে দেখেছিলাম তাকিয়ে তাকিয়ে।

ছাতাটা তুলে নিয়ে জগমামা ঘরের মাঝখানে একবার দাঁড়ালেন। যেন শূন্যকে উদ্দেশ করে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ভালই করলে ভগবান। দুনিয়াটাকে চেনবার যেটুকু বাকী ছিল সম্পূর্ণ হল।

সেই থেকে সাবধান হবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু মজ্জাগত অভ্যাস কতটুকুই বা যায়? অহরহই আমরা কত অসতর্ক মন্তব্য করি,—কে হিসেব রাখে সে মন্তব্য কোথায় গিয়ে পৌঁছয়! হয়তো জগমামীও সত্যিই পিশাচী নয়, হয়তো শুধুই অসতর্ক। কিন্তু সে কথা কে বোঝাবে জগমামাকে!

॥ অগ্নিদহন ॥

চুলের আভা দেখেছেন? চুলের আভা? ঘনকৃষ্ণ কেশদামের নয়, স্বল্পাবশিষ্ট চারটি পাকাচুলের?

দেখেন নি?

তার মানে চন্দর ঠাকরুনকে দেখেন নি। চন্দর ঠাকরুনের পাকা চুল যেন সাদা রেশমের গোছা। তাতে অবিকল রেশমের মসৃণতা আর রেশমের উজ্জ্বল আভা। কিন্তু শুধুই তো চুল নয়? রঙ? গড়ন? মুখ?

এখনও—এই তেষট্টি বছর বয়সেও দুধে-গরদের শাড়ির সঙ্গে পিঠের রঙ এক, পিঠ আর পাঁজরের খাঁজে খাঁজে মাখনের তুলতুলুনি।

আর মুখ?

শুনতে পাই চন্দর ঠাকরুনের 'ঠাকরুন' উপাধি লাভের কারণই নাকি মুখ। ঠাকরুনের মত মুখ। দশের মুখে মুখে ফিরে চন্দ্র ভটচাজ্জির 'ঠাকরুন-মুখী' স্ত্রীর নামকরণ হয়ে গিয়েছিল 'চন্দর ঠাকরুন'। নইলে নিজের নাম তো ওঁর তিলোত্তমা। সার্থকনামা সন্দেহ নেই।

আমরা কত সময় আড়ালে বলাবলি করি, বয়সকালে কী ছিলেন চন্দর ঠানদি! আর কী কাণ্ডই না করতেন কে জানে! করতেন মানে কি আর স্বেচ্ছায় করতেন? অজ্ঞাতসারে। নির্ঘাত উনি অসংখ্য ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়েছেন আর চোখ ট্যারা করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এই তেষট্টি বছরেও বোঝা যায় বয়েসকালে পরমাসুন্দরী ছিলেন চন্দর ঠাকরুন। এ-যুগে 'পরমাসুন্দরী' কথাটা উঠে গেছে। তার কারণ সে সৌন্দর্যও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকাল আর পরমাসুন্দরী চোখে পড়ে না। চোখে যা পড়ে, সে হচ্ছে পরম রূপসী। কিন্তু সে রূপে মুগ্ধ হতে দ্বিধা হয়, সন্দেহ জাগে হঠাৎ এক পসলা বৃষ্টিতে ভিজে গেলে এ রূপের কতটুকু থাকবে!

হয়তো ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ধনুকের মত বাঁকানো ওই ভুরু জোড়াটি কোথায় উড়ে যাবে, তার জায়গায় পড়ে থাকবে আলুসিদ্ধর মত তেলাগোলা একটু

উঁচু আল। হয়তো টসটসে আঙুরের মত রসালো আর রক্তগোলাপের মত রঙালো ওই ওষ্ঠাধর যুগল—কিন্তু থাক্ একালের কথা। সেকালে সত্যিকার সুন্দরী ছিল। এখনও এক-আধটি পাকা আমের মত টুকটুকে বুড়ীর মধ্যে তার প্রমাণ রক্ষিত আছে। তাদের দন্তবিহীন মুখের দরজার আলতা-গোলা পাতলা কপাট দুটি, অথবা বলীরেখাঙ্কিত কপালের নীচে তিলফুলের মত নাসিকাটি অতীত ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন করছে চন্দর ঠাকরুনের।

কিন্তু দোহাই আপনার, সামনে থেকে দেখবেন না চন্দর ঠাকরুনকে। ডান পাশে থেকেও না। শুধু বাঁ পাশ থেকে দেখবেন। বাঁ পাশের পাশ-মুখ। যখন চন্দর ঠাকরুন স্থির হয়ে বসে মালা জপ করছেন, কি নিবিষ্ট হয়ে চালের কাঁকর বাছছেন, নয়তো বা উঠানের ধার থেকে দুব্বো তুলছেন খুঁটে খুঁটে। আর যেই তিনি মুখ ফেরাবেন সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে ফেলবেন আপনার চোখের পাতা দুটি। কারণ ডান দিকে বিভীষিকা, ডান দিক ভয়ঙ্কর।

চন্দর ঠাকরুনের ডান গালের সমস্তটা জুড়ে বীভৎস এক পোড়ার দাগ। কালো-কালো জড়ো-জড়ো-হয়ে-যাওয়া পেশী, চোখটা কুঁচকে গিয়ে আধবোজা হয়ে থেমে আছে, কানটা এক টুকরো বিকৃত মাংসখণ্ড।

ডান চোখ দিয়ে দেখতে পান না চন্দর ঠাকরুন, শুনতে পান না ডান কানে। যখন হাসেন, সামনে থেকে দেখলে বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠতে হয়। তিলফুলের মত নাকের খাড়া দেয়ালের এ-পাশে কে যেন খানিকটা পাঁক আর কাদা লেপে দিয়ে গেছে। ও-পাশে পদ্ম, এ-পাশে পাঁক।

কিন্তু আশ্চর্য, চুলগুলো থেকে গেছে অবিকৃত। শুধু কালো রেশম থেকে সাদা রেশম। আচ্ছা, সেও এক আশ্চর্য নয় কি? কালের হাওয়ায় কালো রেশমের গোছা বিবর্ণ হতে হতে ধূসর, আর ধূসর থেকে সাদা হয়ে গেল; কিন্তু অবিকল কালো থেকে গেল ক্ষতচিহ্নের কদর্য কালিমা! সে আর ফিকে মারল না?

মোক্ষম পোড়া পুড়েছিলুম—চন্দর ঠানদির নিজের মুখের বর্ণনা—তিন মাস লেগেছিল ঘা শুকতে। কত ওষুধ, কত কাণ্ড! কী করে পুড়লাম ভাই বলছিস? ঘরে আগুন লেগে। ভগবান জানেন কেমন করে আগুন

লাগল। দিন দুপুর, তোদের অমুক ঠাকুরদা বাড়ি নেই, আমি একা, হঠাৎ দেখি ঘরের জানলা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর সেই ঘরে আমার যথাসর্বস্ব।...হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে ধোঁয়ার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। কিন্তু ঢুকলে কী হবে? উদ্ধার করতে পারি নি কিছু। শুধু পুড়েই মলাম। তা সত্যি তো আর মরণ নেই, ষাট বছর বয়স পার হয়ে গেল, মুখপুড়ী হয়ে বসে আছি। তিন মাস পরে যখন ঘা শুকাল, একখানা আয়না চেয়ে নিয়ে মুখের কী হাল হয়েছে দেখতে গেলাম। দেখে—সে শুনলে তোরা হাসবি, ভাববি, বুড়ীর ঢঙ দেখো! তা তখন তো আর বুড়ী ছিলাম না ভাই। বত্রিশ-তেত্রিশ বয়েস হয়েছিল, লোকে বলত—আঠার বছরের ছুঁড়ী বলে ভ্রম হয়। হ্যাঁ, কী বলছিলাম—আয়নাতে মুখ দেখেই চিৎকার করে কেঁদে উঠে আয়না আছড়ে ছুঁড়ে ফেলে এমন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, পুরো একটা বেলা নাকি জ্ঞান ফেরে নি। সেই অবধি আয়নায় মুখ আর দেখি নি।

বল কী ঠানদি?

সত্যি কথাই বলছি ভাই। আর কখনও আয়নায় মুখ দেখি নি, আর কপালে টিপ পরি নি, আর বাহার করে খোঁপা বাঁধি নি।

দুঃখে ধিক্কারে এমন হওয়া আশ্চর্য নয়, চুপ করেই থাকি।

চন্দর ঠানদি বোধ করি অতীতের সমুদ্রে অবগাহন করছিলেন, খানিকটা চুপ করে থেকে আত্মগতভাবেই বলেন, আর কার জন্যেই বা করব? তোদের ঠাকুরদা তো আর সেই অবধি মুখপানে চেয়ে দেখেন নি।

তেষট্টি বছরের পুরানো দুর্বল কয়েকখানা পাঁজর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ওঠে।

—এই পুরুষের ভালোবাসা; যে মানুষ বুকে রেখে স্বস্তি পেত না, মাথায় তুলে রাখতে চাইত, রূপ গেল বলে তার এই ব্যাভার। পেটে তো একটা ছেলেপুলে হয় নি, শূন্যপ্রাণ খাঁ-খাঁ করত। তাই একখানি গোপাল পিতিষ্ঠে করেছিলাম। চব্বিশ ঘণ্টা তাকেই নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, ঘুম পাড়াতাম, মুখ মোছাতাম, সেই দেখে—তোদের ঠাকুরদার, বলব কী ঘেন্নার কথা, কী হিংসে! গোপালের সঙ্গে যেন সতা-সতীনের ভাব। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরত। ওর বাসনা যে চব্বিশ ঘণ্টা ওর সঙ্গে মুখোমুখি বসে থাকি। শোন্ দিকি লজ্জার কথা! বাড়িতে না হয় শাশুড়ী ননদ জা-জাউলী নেই,

তাই বলে জোড়ের পায়রার মতন দুজনে শুধু বক্‌বকম্ করব? না হয় বাপের পয়সা ছিল, না হয় বসে খেলে চলত, তাই বলে পুরুষ বেটাছেলে চব্বিশ ঘণ্টা বোয়ের আঁচল ধরে বসে থাকবে? আমাকে রাঁধতে দেবে না, কাজ করতে দেবে না, খালি বলবে—তুমি নীলাম্বরী শাড়ি পরে, খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়িয়ে, পায়ে আলতা আর কপালে টিপ পরে আমার সামনে বসে থাক, আমি নয়ন ভরে শুধু দেখি। হাসছিস? তা হাসতে পারিস, আমি কিন্তু শুনে রেগে মরে যেতাম, বলতাম, শ্বশুর ঠাকুরের অন্যায়ই হয়েছিল সাত-খানা গাঁ চুঁড়ে ছেলের জন্যে সুন্দরী বউ খুঁজে আনা। একটা কালপেঁচী বউ হলে তবে তুমি মনিষ্যির দরে থাকতে। তা সে শাপ ফলল। কালপেঁচীই হলাম।

মরতে মলে আমি তো ঠানদির ডান দিকে বসি না। বাঁ পাশের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবলাম, তাই কি? ঠানদি যেন কোন সুদূর লোক থেকে বলেই চলেন—ছিষ্টিছাড়া ঝোঁক ছিল আমার ওপর, নইলে শুনেছিস কখনও কেউ পাথরের পুতুলকে হিংসে করে? তা সে কপাল যখন পুড়ল—সবই পুড়ল, আমার গোপালও রইলেন না। সেদিন থেকে ভাগ্যের ঘরে শনির দিষ্টি পড়েছিল আর কি! ঘর পুড়ল, গোপাল গেলেন, সোয়ামীর ভালবাসা হারালাম। তবু তো মরণও নেই। পৃথিবীর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি আর বসে আছি।

ঈষৎ বিস্মিত হয়ে বলি, গোপাল আবার কোথায় গেলেন গো ঠানদি? পাথরের গোপালের পা গজাল নাকি?

ভাবি, বোধ করি সোনার চুড়ো-বাঁশীর কল্যাণে চুরি গেছে।

চন্দর ঠানদি শিথিলভাবে বলেন, তা কেন, ঘরসুদ্ধু পুড়ে গেলেন। পাশাপাশি দুখানা কোঠা—একখানা শোবার, একখানা ঠাকুরের। দুখানা কোঠাই তো ভস্মীভূত হয়ে গেল।

শিউরে উঠি মনে মনে। বিগ্রহ ভস্মীভূত? উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক!

কিন্তু আগুনটা লাগল কী করে?—প্রশ্ন করে বসি।

পোড়ারমুখী চন্দর ঠানদিকে দেখে আসছি বরাবর, পোড়ার ইতিহাসটা ঠিক জানতাম না।

সেই তো রহস্য!—চন্দর ঠানদি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলেন, বললাম তো দিনে-দুপুরে। গাঁয়ে আমাদের একটিও শত্রু ছিল না। আমাদের দুটি

প্রাণীকে সবাই ভালবাসত। ভগবানের মার আর কি! হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম? ধোঁয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম, তাই না? কিন্তু লাভ হল না কিছু, সেকেলে সিন্দুকের ভারী ডালা টেনে তুলতেই পারি নে। তবে নাকি বলে—প্রাণের দায়ে মশার গায়ে হাতীর বল আসে, তাই শেষ অবধি তুলে ফেলেছিলাম। কিন্তু ধোঁয়ায় আর ভয়ে চোখে যেন ধাঁধা দেখলাম, মনে হল সিন্দুক বুঝি হাঁ-হাঁ করছে খালি। তা তো নয়, ওতেই তো আমার যথাসর্বস্ব ছিল। বিয়েতে বাবা দু-দুখানা বেনারসী শাড়ি দিয়েছিল, গা-ভর্তি গয়না, ইদিকে শ্বশুর মটুক স্যুটের গয়না পরিয়ে বউ নিয়ে এসেছিল, শাশুড়ী মুখে দেখেছিল মুক্তোর সাতনর দিয়ে, তা ছাড়া—শাল, র‍্যাপার, পার্শী শাড়ি সব ছিল ওর মধ্যে। চোখের ধাঁধা আর কি! চোখেও ধোঁয়া দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে এধারের একখানা জানলার কপাট হঠাৎ 'লাউ লাউ' করে জ্বলে উঠে যেন আমারই দিকে তেড়ে এল। বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা! এদিকের দরজা দিয়ে যে ছুটে পালিয়ে আসব, সে বুদ্ধি জোগাল না, ভয়ে আঁতকে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম।

তাই বলি, আমার গোপালের মতন একেবারে পুড়েও তো মলাম না। সেই মুহূর্তে কর্তার কী করতে বাড়ি ফেরবার দরকার পড়েছিল, এসেই নাকি আমাকে বের করে ফেলেছিল। পাড়ার পাঁচজনে ছুটোছুটি করে আগুনও নিবিয়েছে ততক্ষণে।

জ্ঞান হয়ে দেখি, দালানের চৌকিতে শুয়ে আছি, মুখে-মাথায় ফেট্টি বাঁধা, একটা চোখ তো ঘুচে গেছল, আর-একটা চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখলাম, দেখলাম মুখের কাছে জ্ঞাতি ননদ বসে, তোর ঠাকুরদার ছায়া মাত্তর নেই।

মুখও পুড়ল, অদেষ্টও পুড়ল। সেই অবধি আর কখনও ছেদ্দা করে আমার মুখপানে চেয়েও দেখেন নি। তাই তো বলি পুরুষের ভালবাসার পোড়াকপাল!

সংবাদ নতুন নয়।

এ ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। জানাবধিই চন্দর ঠানদির এই দুর্ভাগ্যের বিবরণ শুনে আসছি এবং পুরুষের ভালবাসার অসারত্ব সম্বন্ধে একটি জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল হয়ে আছেন চন্দর ভটচাজ্জি।

কত লোকের স্বামী বসন্ত হয়ে কদাকার কুৎসিত দৃষ্টিহীন হয়ে যায় এবং সতীসাধ্বী স্ত্রী কী ভাবে তাকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসে, সে উদাহরণও শুনতে পাওয়া যায় চন্দ্র ভটচাজ্জির প্রসঙ্গে।

ভটচায কিন্তু নির্বিকার।

ভোরে উঠে খড়ম খটখটিয়ে গঙ্গাস্নানে যান, ফুল তোলেন, সাজি হাতে করে চলে যান 'সিংহবাহিনী'র মন্দিরে। সেখানে তিন ঘণ্টা পুজো। অতঃপর পাড়া-ভ্রমণ। মধ্যাহ্নে দেবীর প্রসাদভক্ষণ, অবশেষে বাড়ি ফিরে অধ্যয়ন। এই হচ্ছে চন্দর ভটচাজ্জির দিনলিপি।

দেখে-শুনে অভ্যাস হয়ে গেছে সকলের, বহুকাল থেকেই তো হয়েছে, তবু এখনও ওঁর কথা উঠলেই আমাদের মা-পিসিমা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে বলেন—ধম্ম, না, হাতি! ভিট্‌কেলমি! ধম্মজ্ঞান থাকলে আর কেউ বিয়ে-করা পরিবারকে রূপ নষ্ট হয়ে গেছে বলে ত্যাগ দিয়ে রাখে না। ভণ্ড বিটেল। আর ওই পরিবারের যখন রূপ ছিল? তখন আবার এমন আদিখ্যেতা ছিল যে, দেখে গায়ে ধুলো দিতে ইচ্ছে করত। পুরুষের ভালবাসা মোছলমানের মুরগি পোষা।

আটষট্টি বছর বয়েস হয়েছে চন্দর ভটচাজ্জির, তবু এখনও তাঁর ভালবাসার ত্রুটি নিয়ে ধিক্কার দিচ্ছে লোকে। হৃদয়হীনতা জিনিসটা যে বরদাস্ত করা যায় না এই তার প্রমাণ।

কিন্তু সত্যিই কি হৃদয়হীন ছিলেন চন্দর ঠাকুরদা?

হৃদয়হীন? না, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ?

'ছিলেন' বলছি বলে চমকালেন বুঝি? তা চমকাতে পারেন। জলজ্যান্ত সোজা সতেজ লোকটা ফুল তুলতে তুলতে শরীর কেমন করছে বলে এসে শুলো আর মরে গেল, এটা বিশ্বাস করা শক্ত। তবু গেলেন। এইভাবেই গেলেন চন্দর ভটচাজ্জি। মরণকালে চন্দর ঠাকরুন এতদিনের অবজ্ঞার অপমান ভুলে কাছে এসে কেঁদে পড়লেন। চন্দর ঠাকুরদা নিষ্পলক নেত্রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সেই অর্ধদগ্ধ মুখের দিকে, তারপর আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতটা একবার তুললেন। ধপাস করে পড়ে গেল হাতটা।

মনে হল, কী যেন একটা বলবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করছেন। সবাই মিলে হুমড়ে পড়ল মৃতকল্প লোকটার বুকের উপর মুখের উপর। 'শেষকথা' শোনবার কৌতূহলে কম যায় না কেউ।

কিন্তু কথা কই? অস্ফুট একটা শব্দমাত্র। বাস্! হয়ে গেল। দু গজ দূরে পড়ে রইল পিতলের ফুলের সাজিটা, দরজার কাছে পড়ে রইল সন্ত-পরিত্যক্ত খড়ম জোড়াটা, চন্দর ভটচাজ্জি বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

আর সহসা অনেককে পরাজিত করে রাখাল বিশ্বাস বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, আমি শুনেছি। পষ্ট শুনেছি। বললেন—বাগানে সিঁদুরে আমগাছতলায়—

'তাই নাকি, অ্যাঁ!' 'কিছু পোঁতা আছে বুঝি?' 'বুঝি আবার কী? নিশ্চয়ই।'

উচ্চকিত হয়ে উঠল সবাই। সন্ত-মৃতের প্রতি কর্তব্যপালনের থেকেও দুর্বার হয়ে উঠল গুপ্তসন্ধানের কৌতূহল। উপস্থিত ব্যক্তিদের মুখ দেখে মনে হল—শবদাহ প্রস্তাব মুলতুবি রেখে এক-একখানা কোদাল নিয়ে লেগে পড়েন ওঁরা।

আর বলে ফেলেই পরক্ষণে রাখাল বিশ্বাস মনে মনে মাথার চুল ছিঁড়তে থাকেন। হায়! হায়। এ কী বোকামি করলেন তিনি! গুপ্তধনের সন্ধানটি গুপ্ত রেখে কিছুদিন পরে চুপিচাপি দেখে নিলেই হত জায়গাটা। দেখা যেত কী ঘোড়ার ডিম আছে তাতে!

মৃতের শেষকথা শুনতে পাওয়ার গৌরবে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, বলে বসলেন সবাইকে! ছি-ছি-ছি!

কিন্তু আপসোস বৃথা! হাতের ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে।

চন্দর ঠানদির একটা গেঁজেল ভাইপো ছিল কোথায় যেন, সে ঠিক সময়ে এসে পড়ে গম্ভীরভাবে বলল, মড়াটা পুড়িয়ে আসুন আপনারা। আমি এই গাছ পাহারা দিচ্ছি। পিসি আমার চিরটাকাল বঞ্চিত হয়ে থেকেছে, এখনও কি আপনাদের পাঁচজনের দয়ায় ফাঁকে পড়বে?

তার পর?

তার পর যা হল সেটা গল্পকথা হলে মুচকি হেসে হেসে বলতাম—হবেই তো, গল্পের গরু গাছে ওঠে যে! কিন্তু এটা সত্যি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। আমগাছের গোড়া খুঁড়ে বেরোল একটা মজবুত স্টীল ট্রাঙ্ক। তা থেকে বেরল চন্দর গিন্নির বাবার দেওয়া দু-দুখানা বেনারসী শাড়ি, বেরল

পার্শী শাড়ি আর কাশ্মীরী শাল, বেয়োল বাপের বাড়ির গা-সাজানো গয়না আর শ্বশুরের দেওয়া মটুক মুক্তোর সাতলহর।

সত্ত-বিধবা চন্দর ঠাকরুন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে, টুঁ শব্দ বেরল না মুখ দিয়ে। মনে হল চন্দর ভটচাজ্জির মত উনিও না নিথর হয়ে যান! কিন্তু না, নিথর হন নি, বাঁ চোখটা ক্রমশ বিস্ফারিত হতে হতে আর ডান চোখটা ক্রমশ কুঁচকে ছোট হয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক সময় হাহাকার করে চিৎকার করে উঠলেন চন্দর ঠানদি।

কী এই রহস্য? কে জানে! তবে পুরনো একটা রহস্য ভেদ হয়েছে।

তিরিশ বছর পরে প্রমাণিত হল, নিজেই নিজের ঘরে আগুন লাগিয়েছিলেন চন্দ্র ভটচাজ্জি।

কিন্তু কেন?

কেন, তাও জানলাম। এইমাত্র জানলাম চন্দর ভটচাজ্জির রোজ-নামচার খাতা পড়ে। খেরো-বাঁধানো দড়ি-বাঁধা খাতা। তাতেই আপন বক্তব্য ব্যক্ত করে গেছেন চন্দর ভটচাজ্জি।

ধারাবাহিক কিছু নয়, জায়গায় জায়গায় অসংলগ্ন লেখা।

... ...

গোপাল! গোপাল! গোপাল! আমার শনি! আমার সব কিছু ধ্বংস করেছে একটা পাথরের ঢিপি! ও আমার শত্রু, ও আমার রাহু।

... ...

তোমার কী হল!

তুমি কেন এমন হয়ে গেলে? ক্রমেই যে আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছ? মানুষের ভালবাসায় আর দরকার থাকছে না তোমার? শুধু পাথরের ঠাকুরকে ভালবেসেই তোমার সব বাসনা মিটে যাচ্ছে!

... ...

রক্তমাংসের মানবী থেকে, তুমিও কি পাথরের দেবী হয়ে যাবে!

... ...

তোমাকে দেখলে যে আমার ভয় করে, আমার লজ্জা হয় আর সমীহ হয়! দেবতার কাছ থেকে তোমাকে কী করে ছিনিয়ে আনব আমি?

... ...

না না, আবার সইবে না। কিছুতেই সইবে না। তোমাকে হারাতে পারব না আমি। তোমাকে আমি ফিরিয়ে আনব, আবার পরাব তোমায় নীলাম্বরী শাড়ি, পরাব বেলফুলের গোড়েমালা, দেবী থেকে মানবী।

গোপাল! গোপাল! গোপালকে সরাতে হবে। ওকে না সরিয়ে আমার শান্তি নেই। চুরি করে জলে ফেলে দেব? কিন্তু কখন? তুমি যে সব সময় আগলে আছ! আমার কথার উত্তরে সেদিন স্পষ্ট বললে, গোপালই তোমার ধ্যানজ্ঞান। গোপাল তোমার সত্যিকার ছেলের বাড়া। চুরি করতে গেলে যদি ধরা পড়ি? তা হলে কি তুমি জীবনে আর আমার মুখ দেখবে?

নাঃ! চুরি করা যাবে না, অন্য কিছু—অন্য কিছু।

… … …

সর্বনাশ!

এ কী!

এ কী হল?

এ কী করলাম আমি? কী সর্বনাশা বুদ্ধি হয়েছিল আমার!

হে ভগবান, আমি কি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? বিগ্রহমূর্তি ধ্বংস করলাম আমি? হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের ঘরে আগুন লাগালাম?

কিন্তু তাতে কী লাভ হল ঠাকুর? আমার প্রাণের ঘরও যে পুড়ে গেল! প্রাণের সেই ঘরে যে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে মূর্তি যে পুড়ে ঝলসে গেল! এই সৌন্দর্যহীন মূর্তি নিয়ে কী করব আমি?

রূপ?

হ্যাঁ, রূপ ভালবাসি বইকি।

কিন্তু শুধু রূপে কী আছে? রূপের সঙ্গে চাই মহিমা।

ফুলের সঙ্গে যেমন গন্ধ।…

আবোলতাবোল লেখা। হিজিবিজি অস্পষ্ট। চন্দর ভটচাজ্জি যে এত ভাবুক ছিল, একথা কে কবে জানত?

গ্রামসুদ্ধ লোক আমায় ছি-ছি করছে।

করবেই তো। ছি-ছির কাজ করলে করবে না? দুর্ভাগ্যের আচোট

লেগে কুরূপ হয়ে গেছে বলে যে লোক বিয়ে-করা বউকে ত্যাগ দিয়ে রেখে দেয়, তাকে কে ভক্তি করবে?

কিন্তু সেই জন্যেই কি আমি…?

তুচ্ছ রূপ। সবটাই যদি ঝলসে যেত তোমার, কী লোকসান ছিল? যদি—যদি—আমার মনের মন্দিরে তোমার মূর্তি থাকত তাজা? গোপালকে পুড়িয়ে মারতে গিয়ে তোমার সেই মূর্তি যে পুড়িয়ে ফেললাম আমি!

গোপাল তোমার ধ্যানজ্ঞান, গোপাল তোমার প্রাণের পুতুল, গোপাল পেটের ছেলের বাড়া। গোপালের টানে আমার প্রাণভরা ভালবাসাও তুচ্ছ হয়েছিল তোমার কাছে। হ্যাঁ, সেই জন্যেই তুমি বুঝিয়ে রেখেছিলে আমায়।

গোপালকে হিংসে করেছি, কিন্তু তোমার ওই মহিমময়ী মূর্তিকে পুজো করে এসেছি এতদিন।

কিন্তু এ কী করলে তুমি?

আগুন দেখে আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত তুমি, গোপালের ঘরের দিকে দৃক্‌পাত না করে ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিলে তোমার গহনার বাক্স রক্ষা করতে!

ছি ছি ছি!……

ধুয়ে গেল প্রতিমার গায়ের হর্তেল আর ঘামতেলের রঙ। ধুয়ে গেল মাটির ছাউনি। পষ্ট হয়ে উঠেছে খড় আর বাঁশ। এ নিয়ে আমি কী করব!

… … …

কিন্তু এ কথা তো তোমায় বলতে পারব না।

নিজের এই খড়-বাঁশের কঙ্কাল দেখে তুমি শিউরে উঠবে, মরমে মরে যাবে। তার থেকে আমায় ভুল বোঝ। আমায় ঘৃণা কর।

আর কিছু লেখা ছিল কি না জানি না।

শেষের পাতাগুলো আরশোলায় খেয়ে দিয়েছে।

পড়ার শেষে আর-কিছু ভাবছি না, শুধু ভাবছি, সেই খড়ম আর মটকার-থান-পরা লোকটাও একদিন যুবক ছিল, ছিল এমন অদ্ভুত রকমের ভাবুক। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে অবিরাম শুধু লোকনিন্দা আর ছিছিকার শুনে গেছে, কোনদিন আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করে নি।

আর চন্দর ঠাকরুন ?

তিরিশ বছর ধরে শুধু পতিনিন্দাই করে এসেছেন চন্দর ঠাকরুন। আমার অন্যমনস্ক দৃষ্টির সামনে চন্দর ঠাকরুনের চুলের আভা আর সমস্ত রূপের আভা ম্লান হতে হতে কুঁচকে কালো হয়ে যাচ্ছে তাঁর আগুনে-পোড়া ডান গালের মত।

তাই তো বলছি, চন্দর ঠাকরুনদের কখনও অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আচমকা দেখে ফেলবেন না। দেখবেন তাঁর আত্মস্থ অবস্থায়, একটা পাশ থেকে—যে দিকটা তাজা, যে দিকটা লাবণ্যমণ্ডিত।

॥ অন্ধ ॥

চোখ পড়েছিল অনেকক্ষণ আগে, কিন্তু প্রথমটা তেমন গ্রাহ্য করেন নি অনুপমা। ধারণাই করতে পারেন নি এমনটা হওয়া সম্ভব। তবু কিছুক্ষণ পরে নারীজাতিসুলভ কৌতূহলে তাকিয়ে দেখে নিলেন একবার। এবং দেখে যেন কেমন সন্দেহযুক্ত হলেন।

সন্দেহ করেও নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। তাই কখনও হতে পারে? দূর! অনুপমা কি পাগল?

কিন্তু আর কী হওয়া সম্ভব? আশেপাশে অনেকগুলো বাড়ির ছাতের দিকে দেখলেন, আর কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। বিশেষ কিছু কাজ ছিল না ছাতে, তবু অনুপমা তারে-গুছিয়ে-মেলে-দেওয়া কাপড়-জামাগুলোই আবার উল্টেপাল্টে দেওয়ার অভিনয় করে কিছুটা সময় ক্ষেপণ করলেন, তারপর বাঁকা দৃষ্টিতে আর-একবার টুক করে দেখে নিলেন। না, সন্দেহের আর-কিছুই নেই, ধারণার উপযুক্ত না হলেও বিশ্বাস করতেই হবে।

ওদিককার ওই তিনতলা বাড়ির ছাত থেকে যে চোখজোড়া অনেকক্ষণ ধরে এদিকে দৃষ্টিবাণ হানছে, তার টার্গেট হচ্ছেন অনুপমা। হ্যাঁ, অনুপমাই, আর-কেউ নয়।

কারণ আর-কোনও বাড়ির ছাতেই কোনও দ্রষ্টব্য বস্তুর চিহ্নমাত্র নেই।

অনুপমা তা হলে এখনও দ্রষ্টব্য বস্তু?

আরও একবার চোখ না তুলে পারলেন না অনুপমা। এখনও দেখলেন সেই স্থিরনিবদ্ধ অপলক দৃষ্টি। যার লক্ষ্য হচ্ছেন অনুপমা।

বিয়াল্লিশ বছরের অনুপমা।

হঠাৎ ভারি হাসি পেয়ে গেল অনুপমার।

বুঝলেন, আর-কিছু নয়, দূর থেকে ছোঁড়া বয়স বুঝতে পারে নি। অনুপমাকে নির্ঘাত একটি তরুণী সাব্যস্ত করে বসেছে।

মনে মনে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন। তা সত্যি বলতে, দূরপাল্লার পথে অনুপমাকে তরুণী ভেবে বসা—এমন কিছু আশ্চর্যও নয়। বাহুল্যমেদভারবিহীন ছোটখাটো হালকা গঠনভঙ্গির গুণে বয়স ধরা পড়ে না অনুপমার।

নইলে অনুপমার বয়সী অধিকাংশ গিন্নীদেরই তো কী না গিন্নীবান্নী চেহারা! দেখলে হাসি পায়।

তবু এটাও হাসির কথা বইকি!

এই অনুপমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা লোকের চোখ ক্ষয়ে যায়!

ভাবলেন, নীচে নেমেই কর্তার কাছে এই মজার সংবাদটি পরিবেষণ করবেন, কিন্তু সে আর হয়ে উঠল না। সকালবেলা কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ থাকে না, তো হাসি ঠাট্টা!

দুপুরবেলা কাজের চাকাটাকে যখন হাত থেকে নামালেন, তখন হাতে তুলে নিলেন লাইব্রেরির বইখানা। এটা অনুপমার আবাল্যের অভ্যাস। দুপুরে ঘুমের বালাই তাঁর কোনদিনই নেই,, তবে দুপুরবেলা কাজ করতেও ভালবাসেন না কখনও। ওই যে সমস্ত মহিলারা দুপুরবেলার মনোরম অবসরটুকু সেলাই করে কি পশম বুনে, পাড়া বেড়িয়ে কি শৌখিন জলখাবার তৈরি করে বাজে খরচ করে মরেন, তাঁদের দেখলে গা জলে যায় অনুপমার। মানুষ সারাদিন খাটবে, এ অনুপমার দু'চক্ষের বিষ। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার শেষে একখানি উপন্যাস হাতে করে চুল ছড়িয়ে শুয়ে পড়ার চাইতে সুখের আর কী আছে!

অবিশ্যি আজকালকার বইগুলো আর পড়ে তেমন সুখ নেই। ভাব ভাষা ভঙ্গি সবই যেন কেমন দুঃসাহসিক বেপরোয়া-বেপরোয়া। এ বয়সে আর ওসব মনে বসে না। তবু নেশা। চাই একখানা কিছু।

বইটা নিয়ে খাটে শুয়ে পড়বার আগে সামনের আলমারির আরশি-দেওয়া পাল্লাটায় নজর পড়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে পড়লেন। মৃদু একটু হাসির রেখা মুখে ফুটে উঠল। সত্যি বটে, গড়নের ওপরই বয়সের ছাপ পড়ে, নইলে মাথা খুঁজলে পাকাচুল যে বেশ চারটি না পাওয়া যায় অনুপমার তা নয়, মুখের রেখাতেও লক্ষ্য করলে বয়সের পদচিহ্ন ধরা পড়ে। কিন্তু

এই যে হালকা ঝিরঝিরে শরীরটি নিয়ে খোলা চুল এলিয়ে ফরসা শাড়ি-ব্লাউসটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ দেখে দূর থেকে কমবয়সী বলে ভ্রম হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

অনেকক্ষণ নিজেকে দেখে দেখে মৃদু হেসে শুয়ে পড়লেন অনুপমা।

—হ্যাঁ গো মা, ঠাকুর যে বসে রয়েছে, ভাঁড়ার দেওয়া কুটনো কোটা কখন হবে?—বলতে বলতে ঝি সুবাসিনী এসে থমকে দাঁড়াল। হেসে ফেলে বলল, ও হরি, এখনও চুল বাঁধা হয় নি? বসে বসে পাকাচুল তোলা হচ্ছে?

অনুপমাও হাসলেন। বললেন, তা নাতি-নাতনী যতক্ষণ না হচ্ছে, নিজেকেই তাদের কাজগুলো করতে হবে। যাচ্ছি, তুই ততক্ষণ হাত ধুয়ে দুটো আলু ছাড়াগে না।

নির্দিষ্ট কাজ সেরে এবেলাও ছাতে উঠতে হল।

রোজই হয়।

তবে সব দিন কি আর একদণ্ড দাঁড়াবার অবসর থাকে? কাজ সেরেই ছুট দিতে হয়। আজ একটু দাঁড়ালেন।

বিকেলবেলা ছাত থেকে কাচা কাপড় তোলার ডিউটি অনুপমারই। এ বিষয়ে তাঁর বিশুদ্ধতাজ্ঞান খুব সজাগ। ঝি-চাকরকে তো ছুঁতে দেনই না, মেয়েদেরও না।

কাপড়চোপড় তোলবার আগেই চোখ পড়ল সেই তিনতলার ছাতে। ঠিক যে কৌতূহলপরবশ হয়ে নিজে থেকেই তাকালেন তাও না, এমনিই চোখ পড়ে গেল। মানুষের উপস্থিতি বোধ করি অনেকটা চুম্বকের মত। অজ্ঞাতসারেও টানে।

চোখ পড়ল।

চোখে পড়ল সেই সকালের দৃশ্য।

ঠিক তেমনি হাঁ করে তাকিয়ে আছে ছোঁড়াটা।

হাসি সংবরণ দুঃসহ হল অনুপমার, মুখ ফিরিয়ে হেসে নিলেন। আহা রে বেচারা! যা ভাবছিস তুই, তা নয় রে নয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ইরা ধীরা ছাতে না উঠলেই ভাল। এ ছোঁড়াটার রীতি-চরিত্তির তো দেখছি

সুবিধের নয়। আমি বুড়ো মাগী, তাকাক্‌গে মরুকগে। কিন্তু মেয়ে দুটোর দিকে চোখ পড়লেই হয়তো হাসবে-টাসবে। কিন্তু এতদিন তো কই দেখি নি! এল কোথা থেকে?

ভাবতে ভাবতেই ইরা উঠে এল ছাতে। প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে।

মা, শীগগির নাব, দিদি আর জামাইবাবু এসেছেন। বলছেন, আমাদের সিনেমা নিয়ে যাবেন, এখখুনি তৈরী হয়ে নিতে হবে।

অনুপমা প্রথমেই তীক্ষ্ণ কটাক্ষে দেখে নিলেন ইরার দৃষ্টিটা কোন্ দিকে! না, সন্দেহজনক কিছু মনে হল না। অতঃপর তার কথার প্রতি মনঃসংযোগ করলেন। বলা বাহুল্য, সংবাদটা মনঃপুত হল না। এখুনি ছিষ্টি সংসার অনুপমার ঘাড়ে চাপিয়ে তিন বোনে মিলে নাচতে নাচতে সিনেমা দেখতে যাবেন, আর মা-বুড়ী মরুক। অথচ সোজাসুজি বারণও করা যায় না, নতুন জামাইয়ের প্রস্তাব। অপ্রসন্নভাবে বললেন, এই তো সেদিন সিনেমা দেখা হল। আবার কেন?

ইরা ঘাড় দুলিয়ে একটি আহ্লাদীমার্কা ভঙ্গি করে বলে ওঠে, আহা, সে তো কবে! এক মাস হতে চলল। এর মধ্যে কটা নতুন ছবি রিলিজ করেছে তার খবর রাখ? তোমার কাছে তো সবচেয়ে দরকারী খবর আলুর সের ক'পয়সা উঠল নামল। চললাম। আমি কিন্তু আজ তোমার একটা শাড়ি পরব মা। ধনেখালির সাদা শাড়ি যে কী ভীষণ ভাল লাগে আমার! আচ্ছা, এস তুমি শীগগির—

দ্রুত পায়ে নেমে গেল ইরা। যেন অনুপমার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়িয়ে দিয়ে। পেটের মেয়ে। হোক গে। বয়স বাড়লে সন্তানও প্রতিপক্ষের শামিল। বলতে নেই এই যা।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন—

হুঁ, মা সাধ করে হিসেব রাখতে চায় আলুর সের ক'পয়সা উঠল নামল! তোমাদের মত শুধু নেচে বেড়াতে পেলে কে হিসেব রাখতে যেত? এযাবৎ তোমাদের তিন বোনের হরেক বায়নাক্কা মেটাতে মেটাতেই জীবন যে শেষ হয়ে গেল অনুপমার! নিজের বলতে যদি এতটুকু কিছু করবার জো আছে! নিজেদের পঞ্চাশখানা বাহারী শাড়ি, তবু মার সাদা শাড়িগুলো টেনে টেনে পরা চাই। কাজের মধ্যে শুধু সাজব গুজব, গল্পের বই পড়ব,

সিনেমা দেখব, আর বসে বসে আড্ডা দেব। এখন তো আবার জামাইবাবু হয়েছেন—সোনায় সোহাগা!

তোরা তো মাকে ব্যঙ্গ করবিই!

তোদের মত জীবন কি জীবনেও পেয়েছেন অনুপমা? তবু তোদের এত আহ্লাদেও এখনই রূপ ঝরে যাচ্ছে, চুল ঝরে যাচ্ছে। গুছি দিয়ে খোঁপা বেঁধে বড় খোঁপার সাধ মেটাচ্ছিস। আর অনুপমার এখনও—

নিজের মাথার যেমন-তেমন-করে-জড়ানো তিন গুছির খোঁপাটায় প্রায় অজ্ঞাতসারেই একবার হাত পড়ল। এত রাগের ওপরও অজান্তেই একটু হাসি ফুটে উঠল মুখে। লম্বা ছাঁদের ঘাড়ের ওপর এই খোঁপার তালটার জন্যেই বুড়ো দেখাতে দেয় না অনুপমাকে।

কিন্তু তবু বলতেই হবে ছোঁড়াটা আচ্ছা বেকুব! চোখ আর সরাচ্ছে না।

আহা রে, একবার যদি টের পেতিস, কী বৃথা কষ্ট করে মরছিস!

বোধ করি কৌতুকেরও একটা নেশা আছে।

অনুপমাকেও এই কৌতুকের নেশায় পেয়েছে দেখা যাচ্ছে।

শুধু তো নিছক কৌতুকও নয়, এ যেন লোক-ঠকানো আমোদের মত।

ধীরা ইরা বলে, মা, তোমার কী ব্যাপার বল তো? লুকিয়ে আচারের কারবার-টারবার খুলছ নাকি? সকাল বিকেল তোমাকে যে আর দেখতেই পাওয়া যায় না। ছাতে এতক্ষণ কী কর?

অনুপমার বুকটা হঠাৎ একটু কেঁপে ওঠে, প্রায় বয়সকালের মত।

তারপরই গম্ভীরভাবে বলেন, জানিস না বুঝি? ঘুমোই। তোদের সংসারে তো ছুটি নেই, পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচানো ছাড়া উপায় কী?

সুবাস হঠাৎ প্রকৃত কথা ফাঁস করে বসে। এক গাল হেসে বলে, মায়ের আজকাল বড্ডো ধম্মে মতি হয়েছে গো। পুজোর ঘরের গীতা বইখানা নিয়ে গিয়ে ছাতে ওঠে। যাতে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে পড়তে পায়।

কী সর্বনাশ! মা—! ইরা চোখ গোল করে হেসে ওঠে: বড়ো মাসীমার মত তুমিও কি গীতা-পড়া বুড়ী হয়ে যাবে এখুনি?

তা হব নাই বা কেন?—অনুপমা পরম ঔদাসীন্যে বলেন, আমার কি আর বয়েস হচ্ছে না?

তা সত্যি!—সুবাস সায় দেয়ঃ মায়ের পেটে ছেলে হয় নি তাই, নইলে বড় দিদিমণি বেটাছেলেটি হলে এতদিনে ছেলের বউ ঘুরে বেড়াত যে।

অনুপমা উঠে যান।

যাওয়ার ভঙ্গিতে ত্রস্ত ব্যস্ততা, যেন ভুলে কোথায় কী কাজ ফেলে ছড়িয়ে এসেছেন।

উঠে গিয়ে—বোধ করি ভুলে ভুলেই ঘরে গিয়ে সেই আলমারির আরশিটার পাল্লাটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। দেখে দেখে ভেবে পেলেন না, কোথাও কোনখানে কারও বাড়িতে অনুপমার মত চেহারার কোনও শাশুড়ী দেখেছেন কি না! ছেলের বউ ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন শাশুড়ী!

ইরা বলে, আহা! কেন বাপু! ভাল কাজই তো। বরং মা একটু চোখের আড়ালে থাকলে আমাদের বকুনিটা কম খেতে হবে।

হেসে ওঠে ওরা।

আলনা থেকে শাড়িখানা নিয়ে দুবার চারবার উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন অনুপমা, কত শীগগির যে ময়লা হয়ে যায় শাড়িগুলো! হবে না কেন! রান্নাঘরে বসে কুটনো কোটা, রুটি লুচি বেলে দেওয়া, ভাঁড়ার ঝাড়া—সবকিছুই তো অনুপমায় ঘাড়ে। যাকগে মরুকগে। আবার এখন কে ফরসা কাপড় বার করে! বেলা পড়ে আসছে, এখনই সন্ধ্যে হয়ে যাবে, এখনই গিয়ে রান্নাঘরে তাল দিতে যেতে হবে। আবার মনে হল, নাঃ, বড্ড যেন মলিন-মলিন। জামাই বেয়াই হঠাৎ কেউ এসে পড়তেও পারেন। আলমারি থেকে একখানা ফরসা শাড়ি বার করে পরে গীতাখানা হাতে করে ছাতে উঠে গেলেন অনুপমা। একেবারে ওদিকে পিঠ ফিরিয়ে সিঁড়ির দরজার দিকে মুখ করে বসলেন ছাতে-পড়ে-থাকা নড়বড়ে চৌকিটার ওপর—যেমন করে স্কুল-পরীক্ষার আগে ওরা বই নিয়ে এসে বসে ইরা আর ধীরা, যেমন বসত মীরা কলেজের পড়া তৈরি করতে।

ঋজু দেহভঙ্গি, ঘাড়ের-ওপর-ভেঙে-পড়া খোঁপার তাল। এ আচ্ছা মজা! মনে মনে খালি হাসি পায় অনুপমার।

ব্যস্ত হয়ে সুবাস উঠে এল।

ও মা! ঠাকুর বলছে গরম মসলা পায় নি নাকি?

রাগে আপাদমস্তক জলে গেল অনুপমার।

তিক্ত স্বরে বললেন, গরম মসলার অভাবে বুঝি উনুন কামাই যাচ্ছে ঠাকুরের?

আহা, তা কেন! ডালনা তো এখনও কড়ায় ফুটছে। বলছিল, তাই।

তাই তুমি উঠি তো পড়ি করে এই মস্ত দরকারী কথাটি বলতে এলে, কেমন? উঃ, দু দণ্ডের জন্যে যদি একটু শান্তি আছে! রোস যাচ্ছি, গিয়ে ঠাকুরকে একবার—

সুবাস অপ্রতিভভাবে বলে, না বাপু, ঠাকুর কিছু বলে নি, এমনি বলছিল—মা গরম মসলা দিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। তাই আমি ভাবলাম, যাই বলেও আসি, ছাতে একটু বেড়িয়েও আসি। মা কিন্তু আজকাল বড্ড রাগী হয়ে গেছ বাপু।

অনুপমা ঈষৎ নরম স্বরে বলেন, না, হব না! তোদের সংসারে সংসার করতে হলে মরা মানুষেরও মাথায় রক্ত চড়ে যায়, বুঝলি?

সুবাস হেসে ফেলে।

হেসে বলে, মার বেশ কথা! আঃ, কী মিষ্টি বাতাসটি বইছে! যাই বল বাপু, তোমাদের ও কলের বাতাসের আস্বাদ এমন নয়। এখানে এসে প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল। বুঝেছি, তাতেই মায়ের এত ছাতে আসার ঘটা!

যাক, ধরে ফেলেছিস তা হলে!—বলে হাতের গ্রন্থখানি কপালে ঠেকানোর মত করে মুড়ে উঠে দাঁড়ালেন অনুপমা। সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

সুবাসও ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। ফিরতে গিয়ে থমকে বলে উঠল, মা, ছাতে ওই ছেলেটাকে দেখেছ?

ছেলেটা?—অসম্ভব রকম চমকে উঠলেন অনুপমা। আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কোথায়? কাদের ছেলে?

ওই যে গো, ওই সামনের বাড়ির ছাতে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন অনুপমা।

যেন এই প্রথম দেখলেন। দেখে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে বলে উঠলেন, আ গেল যা! হাঁ করে তাকিয়ে থাকার রকম দেখ একবার! ছিঃ! তোর দিদিমণিরা যাই আসে না ছাতে!

সুবাস সঙ্গে সঙ্গে সকরুণ মুখভঙ্গি করে মমতাবিগলিত কণ্ঠে বলে, আহা মা, ওর কি আর দৃষ্টিশক্তি আছে গো! ও যে অন্ধ! কলেজের মাস্টার

ছিল। সেই কলেজের কাজে বুঝি অ্যাসিড না কী ছিটকে দুটি চক্ষুই গেছে। ও-বাড়ির গিন্নীর বুনপো। চিকিচ্ছে করাতে কলকাতায় এসেছে। ডাক্তারে নাকি বলেছে সকাল-সন্ধ্যে নরম রোদ্দুরের সময় চোখে আলো লাগাতে। তাই ওরা ছাতে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। আহা, দিষ্টিশক্তি ঘুচলে আর রইল কী মানষের! কী বলো মা!

দৃষ্টিশক্তিহীন!

কেন কে জানে, হঠাৎ প্রচণ্ড একটা অপমানের মত অনুভূতিতে চোখে জল এসে গেল অনুপমার। মনে হল, নির্বোধ পেয়ে কে যেন অনেকদিন ধরে ঠকিয়ে আসছিল অনুপমাকে, সুবাস ধরে দিয়েছে সেই প্রতারণা!

চোখ ফেটে এলেও তো ফাটতে দেওয়া যায় না। বড় জোর ফাটানো চলে গলা। তাই গলা ফাটিয়ে ধমকে ওঠেন অনুপমা, নে নে, চল্। জগতের যত খবরই কি তোর কাছে আসে! রোদ লাগিয়ে নাকি আবার চোখ ভাল হয়! সাতজন্মে শুনি নি এমন সৃষ্টিছাড়া চিকিচ্ছে।

॥ মফস্বল-বার্তা ॥

রাত্তিরে শুতে এসে ঘরের ভেজানো দরজাটায় হাত দিয়েই চমকে উঠল নীলা। দরজাটা এখন আর শুধু ভেজানো নেই, ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ। চমকে উঠেই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে নীলার। কে? কে? বাড়িতে কেউ নেই, ভিতর থেকে ঘর বন্ধ করল কে? কোন্ দুর্বৃত্ত কী মতলবে নীলার নিভৃত নির্জন শয়নমন্দিরে ঢুকে পড়ে খিল লাগিয়ে বসে আছে?

চিন্তা বাতাসের চেয়ে দ্রুতগামী, সন্দেহ নেই তাতে। নিমেষে মনের মধ্যে সহস্র চিন্তার ঝড় বয়।

সন্ধানী চোর। নিশ্চয় সন্ধানী চোর। জানে, আজ রাত্রে নীলা বাড়িতে একা। তাই নীলার কোন অসতর্ক মুহূর্তে টুক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং একেবারে আশ্রয় নিয়েছে শোবার ঘরে। অবিশ্যি শোবার ঘর ছাড়া ঘর আর কই? নীলা এতক্ষণ যেখানে ছিল, যাকে রান্নাঘর বলা হয় সে তো ঘর নয়, বারান্দার কোণ মাত্র। কিন্তু এখন নীলা কী করবে? এত কথা অবিশ্যি এক লহমাতেই ভাবা হয়ে গেল। ভাবল, চেঁচামেচি করা ঠিক নয়, তার চাইতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে—

ভাবলে কী হবে?

ততক্ষণে অভ্যাসগত প্রেরণা কণ্ঠের পথ দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিয়েছে একটা আর্ত প্রশ্ন: কে? কে ঘরের মধ্যে?

স্বর আর্ত কিন্তু অস্ফুট।

ঘরের মধ্যে অবস্থিত লোকটা কি দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে ছিল, তাই অমন অস্ফুট প্রশ্নটাও কানে পৌঁছল তার? সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ততোধিক মৃদু কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, আমি—আমি নীলা, আমি।

আমি! আমি কে? কার কণ্ঠ হতে ধ্বনিত হল এই 'আমি'?

নীলা কি জেগে আছে? না, শয়তান লোকটা নীলার বিভ্রান্তি ঘটাতে এই এক সর্বনেশে ফাঁদ পেতেছে? হ্যাঁ, নিশ্চয় তাই। কিন্তু তবু নীলা ছুটে

চলে যেতে পারল না কেন? ওর পা দুটো কি কেউ পেরেক দিয়ে পুঁতে রেখেছে ওই বন্ধ দরজার সামনে?

দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে।

হাওয়ার শনশনানির মত শব্দ: দোহাই নীলা, চেঁচিয়ে উঠো না। ভেঙে দিও না আমার জীবনের স্বপ্ন।

বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘরের মধ্যে পা ফেলল নীলা, নিজের অজ্ঞাতসারেই দরজাটা ফের ভেজিয়ে দিল। বাড়িতে কেউ নেই, বাইরের দরজা বন্ধ, তবু এই সাবধানতা কেন কে জানে! তা সাবধানতা মানুষ সহজে ছাড়ে না, নইলে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েও দুটো পাল্লার মাঝখানে চারটে আঙুল আটকানো থাকল কেন নীলার? এ-ভঙ্গি দরকার হলে চট করে খুলে বেরিয়ে পড়বার।

লোকটা আর-একবার মিনতি করে: সব কথার আগে মিনতি করছি নীলা, ভুল বুঝে চেঁচামেচি কোর না। অনেক দুঃখের সমুদ্র পার হয়ে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছি।

আলো জ্বালব আমি?

নিঃসংশয় হতে চাও?—মৃদু একটু হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকারে: লাইট জ্বেলো না, দেওয়ালেরও চোখ আছে, আলো আমি জ্বালছি।

ফস করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাইকাঠি, তার থেকে জ্বলল একটা মোমবাতি। আর এগারো বছর পরে নীলা প্রথম প্রশ্ন করল—কুশল প্রশ্ন নয়, দীর্ঘ বিরহ-কালের কোন দুরবস্থার প্রশ্ন নয়—প্রশ্ন করল, বাতি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ? হয়তো এইটাই স্বাভাবিক। ভিতরে যখন অজস্র কথার ঝড় বইতে থাকে, তখনই সব থেকে মূল্যহীন কথা মুখে আসে।

নীলার আর নিজের মাঝখানে বাতিটা উঁচু করে তুলে ধরল লোকটা। বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, চিনতে পারছ, না কি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলেছ?

বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকল নীলা বাতির-আলো-পড়া বিষণ্ণ সেই মুখটার দিকে, মাথা থেকে খসে পড়ল ওর নরুনপাড় ধুতির বেষ্টনীটুকু, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার প্রান্তভাগ, সাদা-লংক্লথের-ব্লাউস-পরা বুকটা কাঁপতে লাগল থরথর করে, থরথর করে উঠল সর্বাঙ্গ।

এক মিনিট—দেড় মিনিট—সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলা তার বুকের উপর: তুমি! তুমি! তুমি সত্যি ফিরে এলে?

বাতিটা ছিটকে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। অন্ধকার? ক্ষতি কী! দুটি নরনারী যেন স্পর্শের মধ্যে পরস্পরকে ফিরে পেতে চায়, যেন পরীক্ষা করতে চায় এই মুহূর্তের নিকট-সান্নিধ্যে দীর্ঘ এগারো বছরের ব্যবধান লুপ্ত করে ফেলা যায় কি না?

কী ভাবছ আমাকে? প্রেতাত্মা?

আঃ! কী বলছ? কিন্তু দোহাই তোমার! একটিবার আলো জ্বালতে দাও আমায়। শুধু একটিবার। বিশ্বাস করতে দাও, সত্যি তুমি এসেছ।

সে ইচ্ছে তো আমারও করছে নীলা, কিন্তু বড় ভয়—বড় ভয়। জানলা-গুলো ভাল করে বন্ধ করে দাও তবে। এতটুকু ফুটো থাকে না যেন, এক বিন্দু আলোর রেখা বাইরে যায় না যেন।

বন্ধ জানলাগুলো একবার টেনে টেনে দেখে সুইচের শব্দ না করে আলো জ্বালায় নীলা, আর আরও একবার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখতে থাকে, কতটা পরিবর্তন হয়েছে বিশ্বজিতের! খাটের উপর এসে বসে বিশ্বজিত। অকারণে একবার বিছানার শুভ্র চাদরটার উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে বিহ্বল-ভাবে প্রশ্ন করে, এখানে শোও বুঝি?

এও এক অর্থহীন প্রশ্ন।

নীলা খাটের পাশটা চেপে দাঁড়িয়ে আছে, স্খলিত আঁচলটা তুলে জড়ো করে নিয়েছে বুকের উপর, কালো চুলের অরণ্যের মধ্যে পদচিহ্নরেখার মত সরু সিঁথিটা বিছানার চাদরখানার মতই শুভ্র।

মৃদু হাসির রেখা দেখা দেয় ওর মুখে; বলে, তা শুই। এগারো বছর কাল বিছানা ত্যাগ দিয়ে মাটিতে শুয়ে কাটিয়েছি এ-কথা বললে হয়তো ভাল শোনাত, কিন্তু সত্যি কথা হত না। জান তো চিরদিন আমি সব কষ্ট সইতে পারি, পারি না খারাপ বিছানায় শুতে।

খুকু আর তুমি শোও?

মুহূর্তে মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে নীলার; রূঢ় কণ্ঠে বলে, তা ছাড়া আর কী শুনতে চাও?

থতমত খেয়ে যায় বিশ্বজিৎ, তাড়াতাড়ি বলে, আমি কিছু ভেবে বলি নি নীলা, কিছু ভেবে বলি নি। শুধু কথা খুঁজে পাচ্ছি না বলেই যা হোক কিছু বলে ফেলেছি।

কঠিন রেখা কোমল হয়ে আসে, কাছে বসে পড়ে নীলা রুদ্ধকণ্ঠে বলে,

কথার সমুদ্র ভেতরে নিয়ে কথা খুঁজে পাচ্ছ না? তাই বটে। আমিও তো এখনও জিজ্ঞেস করি নি—এতদিন কোথায় ছিলে, কেমন ছিলে? আর এমন করে এলে কী করে?

তারপর উথলে ওঠে পুর্ণিমার জোয়ার।

কথা আর কথা।

অর্থহীন অন্তহীন খেইহীন কথা।

খুকু তোমার ছবিতে রোজ নমস্কার করে, জান? স্কুলে যাবার সময় আর ঘুম থেকে উঠে। ছবিতে মালা পরায় তোমার জন্মদিনে, আর—

আর কী? কী বলতে গিয়ে থামলে নীলা? জন্মদিনে, আর? মৃত্যুদিনে বুঝি? বুঝতে পেরেছি, তোমার সাজ দেখেই বুঝতে পেরেছি। বেচারা খুকুকে পিতৃহীন করে রেখে দিয়েছ।

বালিশের উপর লুটিয়ে পড়ে নীলা কম্পিত স্বরে বলে, তা ছাড়া আর কী উপায় ছিল? বল, আর কী উপায় ছিল তোমাকে তার কাছে বাঁচিয়ে রাখবার? কী জবাব দিতাম আমি তার কাছে যদি শাড়ি চুড়ি পরে ঘুরে বেড়াতাম, আর—

ঠিকই করেছ নীলা।—বিশ্বজিৎ সস্নেহে ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলে, ঠিকই করেছ। আমার মৃত্যু দিয়ে তুমি ওর কাছে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। প্রকৃত ঘটনা জানলে আর যাই হোক, বাপের ছবিতে ফুলের মালা পরাবার বাসনা খুকুর জাগত না। কিন্তু এখন কী করবে?

এখন?—নীলা বিহ্বলভাবে বলে, তুমি কি ওকে দেখা দেবে?

দেখা দেব! দেখা দেব কি না জিজ্ঞেস করছ?—অস্বচ্ছ একটু হেসে উঠে বিশ্বজিৎ বলে, ঠিক করেছি এবার তোমাদের কাছেই থেকে যাব। আর এমন করে পালিয়ে বেড়াতে পারছি না। তোমাদের কাছে তাই এসে পড়লাম, স্বাস্থ্যটাও একেবারে ভেঙে গেছে।

নীলা ম্লান দৃষ্টিতে একবার ওর সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, সে-অপরাধ স্বাস্থ্যের নয়। কিন্তু কিছু মনে কোর না, একটা কথা বলছি, ওয়ারেন্ট কি তুলে নিয়েছে?

তুলে! এ-জীবনে নয়। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাড়া করে বেড়াবে।

তবে ?

তা জানি না, ঠিক করেছি—যা থাকে কপালে। পরিচয়টা ঠিক করে ফেল। স্বামীর বন্ধু ? দূর-সম্পর্কের ভাই ? যা হোক। কলকাতা থেকে এত দূরে, এই ছোট্ট মফস্বল-শহরটুকুতে কে আমাকে চিনে রেখেছে ?

চিনে রাখবে !—নীলা ম্লান হেসে বলে, ছোট্ট একটু মফস্বল-শহর বলেই তো ভাবনা। সবাই যে সবাইয়ের তত্ত্বতল্লাশ করে। বিধবা স্কুল-মাস্টারনীর একক ঘরে স্বামীর বন্ধুকে অথবা দূর-সম্পর্কের ভাইকে বাস করতে দেখলে কে উদাসীন থাকবে ?

ওই ছুতো করে তাড়িয়ে দিতে চাইছ ? খুনী আসামীর সঙ্গে ঘর করবার সাহস হচ্ছে না ?

তা তো বলবেই।—নীলা একটা নিশ্বাস ফেলে।

আচ্ছা নীলা, খুব সত্যি করে একটা কথা বলবে ?

হ্যাঁ, বলব। আর তুমি যা জিজ্ঞেস করবে জানি।

তা হলে বল। বল, জীবনে একদিনও কি তুমি আমাকে খুনী বলে ঘৃণা কর নি ?

না।

কিন্তু কেন কর নি ?

জানি, তুমি খুন করলেও অন্যায় কর নি।

নীলা, নীলা! শুধু এই জন্যে! শুধু এই জন্যেই এই ঘৃণিত পলাতক জীবনের, ছদ্মজীবনের বোঝা বহন করে চলেছি—মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর। কিন্তু আর পারছি না পালিয়ে বেড়াতে। জীবনকে আমি আবার ফিরে পেতে চাই নীলা। যে জীবন ফুলস্পীডে চলতে চলতে হঠাৎ পাথর চাপা পড়ে থেমে গিয়েছিল, তাকে পাথর খুঁড়ে আবার উদ্ধার করে বাঁচাতে চাই। ফিরে পেতে চাই আমার স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার সংসার।

নীলা অস্ফুট কণ্ঠে বলে, কিন্তু পুলিস—

সে-ভয়কে আমি জয় করেছি নীলা। অনেক দূরে পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা এক দেশে বেঁচে উঠেছি আমি, সেখানে নিয়ে যাব তোমাদের।

আমাদের নিয়ে যাবে ?

হ্যাঁ, অবাক হচ্ছ কেন ? এখানে থাকলে তো ভয় নিয়ে বাস! পুলিসের ভয়, লোকনিন্দার ভয়, অনাহারের ভয়। সেখানে নির্ভয়ে তুমি, আমি

আর খুকু নতুন করে জন্মাব। কিন্তু খুকু আমায় চিনতে পারবে তো? তার কাছে তো আমাকে মরিয়ে রেখেছ?

নীলা মৃদু হেসে বলে, বললেই তো—'নতুন করে জন্মাবে'।

রাত শেষ হয়ে আসে। নীলা বলে, খুকুটা আজ রাতে বাড়ি নেই; এ ভগবানের আশীর্বাদ। নইলে—

নেই সে খবর জেনেই এসেছি নীলা।

ও, তাই বুঝি?—নীলা হেসে ওঠে, একেবারে পাকা চোর!

হাসির হাওয়া পালে এসে লেগেছে, তবু নিশ্চিন্তা কই? সব কথা সব হাসির অন্তরালে ঢেউ উঠছে অস্বস্তির, দুর্ভাবনার। এ-রাত যদি কোনদিন শেষ না হত!

অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না এই রাত্রি, অনন্তকালের গায়ে স্থির হয়ে থাকতে পারে না এই রুদ্ধদ্বার নির্জন ঘর?

কিন্তু তা হয় না, তা হবার নয়।

রাত্রি এক সময় শেষ হয়, খুলতে হয় রুদ্ধ কপাট।

ও মা, মা গো মণি! তুমি গেলে না, কী মজা যে হল!—হৈ-হৈ করতে করতে বাড়ি ঢোকে খুকু। শাড়ির আঁচল স্খলিত, আলগা করে বাঁধা বেণী উস্কোখুস্কো, বিপর্যস্ত। মুখে ক্লান্তি আর স্ফূর্তির অপূর্ব সমন্বয়। তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে তবু ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল স্বরে বলে, জান মা, মণ্টির বরের আমি নাকি শাশুড়ী হলাম। বাসরঘরে কত গান হল! আমায় বলছিল গান গাইতে। আমি যেন গান গাইতে জানি!

আপন খুশিতে উচ্ছল খুকু; মায়ের ভাবান্তর তার নজরে পড়ে না।

তার বারো-তেরো বছরের নিস্তরঙ্গ জীবনে এই বিবাহ-উৎসবের বৈচিত্র্য তুলেছে এক নতুন তরঙ্গ। পাড়ার সূত্রে মাসীমা, তাঁর নাতনীর বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল মাতা-কন্যার। নীলা যায় নি। দুর্ভাগ্যের পরিচয়লিপি অঙ্গে এঁটে উৎসব-গৃহে যেতে ইচ্ছে তার করে না। অনুরোধে পড়ে মেয়েকে পাঠিয়েছিল ঝিয়ের সঙ্গে। এবং খুকুর পক্ষে বেশী রাতে মাঠ পার হয়ে বাড়ি আসার চাইতে বরং বিবাহ-বাড়িতে থেকে যাওয়াই সমীচীন ভেবে রাতে আসতে বারণ করেছিল।

খুকুর জীবনে এ এক নতুন আস্বাদ।

একে তো উৎসবের খাতিরে ফ্রক ছেড়ে পরেছে মায়ের একখানা সিল্কের শাড়ি, যে-শাড়ি সামলাতে অস্থির হয়ে গেলেও নিজেকে ভারিক্কি ভেবে ভারি ভাল লাগছিল—একদিনেই যেন বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে উঠেছে খুকু।

এতগুলো কথা বলার পর মার ভাবান্তর খুকুর চোখে পড়ে। একটিও কথা বললেন না মা! খুকুর এত বড় বিজয়-অভিযানের অন্তে মার এই নীরবতা কী অদ্ভুত, কী অস্বাভাবিক! ও, খুকু রাত্রে আসে নি বলে অভিমান হয়েছে বুঝি? তা ওর কী দোষ? মা নিজেই তো বলেছিলেন। কিন্তু খুকু তবুও চলে আসবে, মাকে একা থাকতে দেবে না—এই ভেবেছিলেন বুঝি?

আপন মনে প্রশ্নোত্তর। তবু অভিমানে চোখে জল এসে পড়ে।

মা, রাগ করেছ?

রাগ? রাগ করব কেন?

তবে কথা বলছ না কেন?

বলছি তো।

ওই তো ওই রকম করে বলছ! নিশ্চয় রাগ করেছ। সত্যি মা, তোমার একলা থাকতে খুব খারাপ লেগেছে, না?

নীলা এবার যেন আত্মস্থ হয়, নড়ে-চড়ে স্থির হয়ে বলে, একা তো থাকি নি, একা থাকতে হয় নি। রাত্রে একজন এসেছিলেন।

রাত্রে এসেছিলেন! কে এসেছিলেন মা?—উৎসুক প্রশ্ন করে খুকু, লাবণ্য পিসি বুঝি?

না।

না? তবে কে মা?

তুমি চেন না, আমাদের খুব নিকটজন।

ইস্, খুব নিকটজন, আর আমি চিনি না! চালাকি করা হচ্ছে। নিশ্চয় লাবণ্য পিসি।

খুকুর জ্ঞানে ওই একটি মানুষকেই কদাচ কখনও আসতে দেখেছে খুকু। নইলে রেলভাড়া দিয়ে নীলাকে দেখতে আসবে আত্মীয়স্বজনের কাছে নীলা এত দামী নয়। লাবণ্য পিসি সত্যি করে আত্মীয় নয়, তাই। তিনিই নীলার ছিন্নভিন্ন ছত্রখান জীবনটাকে কুড়িয়ে তুলে নিয়ে অনেক চেষ্টায় কোন রকমে

প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। তাঁর প্রাণপণ চেষ্টাতেই মফস্বলের এক সেলাই-স্কুলের এই সামান্য চাকরিটুকু নীলার। তাঁর চেষ্টাতেই এই কোয়ার্টারটুকু।

কখনো-সখনো তিনিই এসে দু-চারদিন থেকে যান।

নীলা মাথা নেড়ে বলে, বললাম তো লাবণ্যদি নয়।

তা হলে বল কে ?

বলব পরে। তুমি আগে মুখ হাত ধোও।

উঃ, একটা কথা বলতে অত ভূমিকা করছ কেন মা ? যাচ্ছি আমি, দেখে আসছি—

শোবার ঘরের দিকেই অগ্রসর হয় খুকু। আগন্তুককে অবশ্য মহিলা ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারে না সে।

নীলা ওর শাড়ির কোণটা ধরে ফেলে। বলে, এখখুনি যেয়ো না, আগে শোন কে তিনি।

খুকু হতাশভাবে বলে, নাঃ, তুমি আজ একেবারে রহস্য-রোমাঞ্চ।

ধপ করে বসে পড়ে সে আবার।

নীলা যেন খেই পায় না, কোন্ দিক থেকে শুরু করবে কথাটা! এত সহসা কেমন করে বলবে, জ্ঞান অবধি তুমি যাকে মৃত বলে জান, সেই ব্যক্তি সশরীরে এসে উপস্থিত হয়েছে, নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে তোমার মায়ের শয্যার একাংশে ? তা ছাড়া তাতে আশঙ্কা ঢের।

তাই ইতস্তত করে বলে, শোন, তুমি তাঁকে ছেলেবেলায় দেখেছ, কিন্তু এখন ঠিক বুঝতে পারবে না, তবে আপাতত শুনে রাখ, উনি আমাদের বড় বন্ধু। তোমার বাবাকে জানতেন উনি।

বেটাছেলে ?—অসতর্কে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে যায় খুকুর।

নীলার মুখটা লাল হয়ে যায়। ও শুধু মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানায়।

খুকু নির্বাক।

নাও, এখন মুখটুখ ধোও। উনি ঘুমচ্ছেন, উঠলে প্রণাম করবে।

এই যে খুকু!—বিশ্বজিতের কাছে সহাস্যে পরিচয় করিয়ে দেয় নীলা, দেখুন কত বড় হয়ে গেছে। প্রণাম কর খুকু।

গত রাত্রেই একরকম ঠিক করে রেখেছিল ওরা, চট করে পরিচয় প্রকাশ করা চলবে না খুকুর কাছে। কারণ, ছেলেমানুষের বুদ্ধি, হয়তো এখুনি কার

কাছে গল্প করে বসবে আর কোন্ ফাঁক দিয়ে আসবে বিপদ! তার চাইতে বিদেশে চলে গিয়ে, সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে তবে বলবে। তাই এই 'আপনি' সম্বোধনের ছল।

বিশ্বজিৎ সস্নেহ গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এখনও ওর নাম শুধু খুকু?

নাঃ, তা কেন? পোশাকী নাম তো একটা আছে। মধুমিতা। ভাতের সময় যে নাম হয়েছিল।—বলেই থেমে যায় নীলা। খুকু কিন্তু মায়ের নির্দেশে প্রণাম করে না, কেমন এক অনমনীয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

একান্তই তাদের মায়ে-ঝিয়ের ঘরের মধ্যে নিতান্ত শুচিস্নিগ্ধ বিছানায় এই লোকটাকে বসে থাকতে দেখে তার মনটা অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে।

কই রে খুকু, প্রণাম কর্। কী বোকা মেয়ে রে তুই?

মেয়ের অভদ্রতার ত্রুটিটুকু সামলে নিতে চেষ্টা করে নীলা।

গজখানেক দূর থেকে প্রণামের মত একটা ভঙ্গি করে খুকু।

মেয়ে দেখে বিশ্বজিৎ যেন হতাশ হয়ে যায়।

কিন্তু কেন? ওর কি বাস্তববুদ্ধি ছিল না? দু বছরের মেয়েকে রেখে এগারো বছর পরে ঘুরে এলে, সে কি সেই মূর্তি নিয়েই ছুটে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে? সে কি জানবে, তোমার চিত্ত কত তৃষিত হয়ে আছে সেই কচি কোমল স্পর্শটির আশায়?

নাকথ্যাদা ভুরুবিহীন তুলোর পুতুলের মত সেই অদ্ভুত সুন্দর মেয়েটা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে বুঝে ফেলে যেন শোকাহত হয়ে গেছে বিশ্বজিৎ।

কোন্ ক্লাসে পড়?

খুকু নীরব।

নীলা তাড়াতাড়ি বলে, কই, বল্? বল্ কোন ক্লাসে পড়িস!

তথাপি নীরবতা অব্যাহত থাকে।

লজ্জায় পড়ে গেছে।—খুকুর মাথা ডিঙিয়ে বিশ্বজিতের চোখে চোখে একটা ইশারা করে বলে নীলা, কোন্ ছেলেবেলায় দেখেছে আপনাকে, মনে তো নেই।

কিন্তু মাথা ডিঙতে পারলেই কি বিপদ ডিঙনো যায়? সামনের আরশি-টার দিকেই যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল খুকু, পিছন থেকে এ-কথা কেমন

করে জানবে নীলা? আরশিতে-দেখা মায়ের হাস্যোৎফুল্ল মুখখানা যে তাকে ক্রমশই কঠিন করে তুলছিল তা-ই বা বুঝবে কেমন করে?

মায়ের এমন মুখ কবে দেখেছে খুকু?

তাঁর বিষণ্ণ মূর্তিটাই প্রধান। অবিশ্যি কারণে-অকারণে হাসে নাকি আর? উচ্ছ্বসিত হাসিও হাসতে দেখেছে বইকি, কত সময় দেখেছে। কিন্তু না হেসেও এমন আলো-ঠিকরে-পড়া মুখে তাকাতে দেখেছে কবে?

নীরবতাটা অস্বস্তিকর।

বিশ্বজিৎ আবার বলে, কই, বললে না তো কোন্ ক্লাসে পড়?

ক্লাস নাইনে।

ক্লাস নাইন! রীতিমত বড় মেয়ে! আর একবার আহত হয় বিশ্বজিৎ। ওর মনে হয়, কোথায় যেন একটা বিরাট ক্ষতি হয়ে গেছে ওর। যেন যে-ব্যাঙ্কে ওর আজীবনের সঞ্চয় গচ্ছিত ছিল, হঠাৎ সেই ব্যাঙ্কটা ফেল হওয়ার খবর পেয়েছে সে।

কথা এগোয় না।

আমি যাই।—বলে এক সময় চলে যায় খুকু।

সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে হয় নীলাকে।

বিলাসী বলে, যা হোক তবু নিরুদ্দিশ রাজার স্মরণ হয়েছে, ভেয়েরা মাকে নিতে পাঠিয়েছে! ইনিও কি তোমার আপন ভাই মা?

নীলা গম্ভীরভাবে বলে, আপন ভাই আমি কোথায় পাব বিলাসী? আপন ভাই কি আমার আছে? তাকে তো ভগবান অনেক দিনই নিয়েছেন।

কিছু মনে কোর নি মা, এমনি শুধচ্ছিলাম।—বিলাসী অপ্রস্তুত হয়ে বলে, ক দিনের জন্যে যাচ্ছ?

দেখি! দু-দশ দিন হবে হয়তো।

দেরি কোর নি মা।—বলে বিলাসী স্কুলের কাজে চলে যায়।

বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়ে নিয়ে আসা তার আসল কাজ। সকাল-সন্ধ্যা নীলার কাজ করে।

নীলা রান্না করে পরিপাটি করে, তবু হাতে পায়ে মনে যেন অভিসারিকার চাঞ্চল্য। প্রতীক্ষা করে খুকু কতক্ষণে স্কুলে যাবে! নিজে আজ আর যাবে না সে। চলে যেতে হবে এখান থেকে, কতদিনের বিরহ-নিশ্বাসরুদ্ধ ঘরখানা

একদিনের জন্ম মিলনের সৌরভে প্রাণ পাক। রাত্রে তো খুকু আছে, আছে অনেক সমস্যা।

নিঃশব্দে ভাত খেয়ে নিঃশব্দেই বই-খাতা গুছিয়ে বেরিয়ে গেল খুকু। নীলা আড়ে আড়ে ওর জলদগম্ভীর মুখখানা দেখছিল। বুঝছে ব্যাপারটা খুকুর বিশেষ পছন্দ হয় নি। না হবারই কথা। আহা! এই দণ্ডে যদি সত্যি কথাটা বলা যেত!

কী ভয়ানক খুশী হত খুকু!

কী ভয়ানকভাবে চমকে যেত! চমকে গিয়ে কী রকম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত! না কি সহজে বহন করতে পারত না সেই প্রচণ্ড আনন্দের ভার! তা হলে হয়তো এই-ই ভাল।

মেয়ে চলে গেলে পারিপাটি করে স্বামীকে খাওয়াল নীলা, বিশ্বজিতের অনেক অনুরোধেও একত্র খেতে বসল না, বসল পরে। অনুরোধ রাখল—অশনে নয়, বসনে। নরুনপাড় ধুতিখানা ছেড়ে পরল পুরনো দিনের একখানা ঢাকাই শাড়ি, চিকনের-কাজ-করা ব্লাউস। শেষ বিবাহ-বার্ষিকীর দিন যে শাড়ি জামা উপহার দিয়েছিল বিশ্বজিৎ। সিঁথেয় সিঁদুর দিতে ভয় করে, খুকু আসার আগেই তো ছেড়ে ফেলতে হবে এই বাসরসজ্জা। অনেক দিনের অনভ্যস্ত হাতে কপালে আঁকল ছোট একটি সিঁদুর-টিপ।

বাইরের দরজায় ভাল করে খিল এঁটে এসেও স্বস্তি হয় না, ঘরের দরজা জানলা আঁটতে হয়। কে কোন্ দিক থেকে দেখে ফেলবে, কে জানে! সাবধানের মার নেই।

কোথা দিয়ে কেটে গেল অত বড় দুপুরটা, কখন বেলা গেল গড়িয়ে! গত-কালকের সারারাত্রিব্যাপী অনিদ্রার শোধ নিতে বেলা তিনটের সময় যে নিদ্রা এসে মায়াকাজল বুলিয়ে দেবে চোখে, তা-ই বা কে ভেবেছিল?

প্রচণ্ড একটা দোর ঠেলার শব্দে তন্দ্রার জগৎ থেকে ছিটকে এসে পড়ল নীলা, আর ধড়মড় করে ছুটে চলে গেল দরজা খুলতে।

কপালের সিঁদুর-টিপটা যে লেপে গেছে সারা কপালে, আর পরনে আছে ঢাকাই শাড়ি আর চিকন-করা ব্লাউস—এ-কথা ভুলেই ছুটল। এত অসহিষ্ণু করাঘাত কার? খুকুর? এ-রকম তো কোনদিন—?

নীলা ভুলে যায় এ-রকম দিনই বা এসেছে কবে? নীলা নিজের সেলাই-

স্কুল-ফেরত খুকুর স্কুলের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খুকুর আগে হলে, সে আসে সেলাই-স্কুলের দরজায়।

খিল খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে ঠেলে দরজাটা হাট করে দিয়ে খুকু অস্বাভাবিক চিৎকার করে ওঠে, কী, হয়েছিল কী?

পরক্ষণেই মায়ের দিকে তাকিয়ে পাথর।

শাড়ির পাড়ের কথা প্রথমটা মনে পড়ে নি নীলার, থতমত খেয়ে বলে, খুব বুঝি ডেকেছিস? হঠাৎ কী রকম ঘুমিয়ে—

পরক্ষণে সেও পাথর হয়ে যায় মেয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে। এ কী সর্বনেশে ভুল করে বসল সে!

হাতের বইগুলো রান্নাঘরের দাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গটগট করে উঠে গেল খুকু ছাতে, একতলা এই বাড়িটুকুর যা পরম সম্পদ। হাত দেড়েক লম্বা চিলেকোঠাও আছে কিনা একটা।

ছাতটা ন্যাড়া ছাত বলে মেয়েকে একা বড় উঠতে দেয় না নীলা। তা ছাড়া এখন তো পড়ন্ত বেলার কড়া রোদ্দুর। কিন্তু নিষেধ করবার সাহস হয় না নীলার।

খুকুর মনে কি শুধুই অপছন্দের বিরক্তি?

না কি সন্দেহ জেগেছে মনে? জগতের সবচেয়ে কুটিল সন্দেহ?

নাঃ, দেরি করে দরকার নেই, আজ রাত্রেই সত্যি কথাটা ওকে বলে দিতে হবে।

চিলেকোঠা থেকে নামানো গেল না খুকুকে, ওর নাকি ভীষণ মাথা ধরেছে।

নীচে এসে বিপন্নমুখে বলে নীলা, খুকুটা তো মুশকিল বাধাল!

বিশ্বজিৎ ক্ষুব্ধহাস্যে বলে, তাই দেখছি। বেশ ছিলে তোমরা, আমিই এসে মুশকিল বাধালাম।

আঃ! কী যে বল! শোন, আমি ভাবছি ওকে জানিয়ে দেওয়াই হোক, নইলে যাবার সময় গোলমাল বাধাতে পারে।

বেশ, শুধু—

কী শুধু?

নাঃ। হঠাৎ মনে হল, আকাশের স্বপ্ন মাটিতে আছড়ে ভেঙে পড়বে না তো? কেমন যেন আতঙ্ক হচ্ছে।

ও-কথা কেন? এখনও তুমি তেমনি কবি-কবি আছ। উঃ!

কিন্তু সত্যি কথাটা কী ভাবে জানিয়ে দেওয়া যাবে?

খুকুর মুখে চোখে, বোধ করি, সর্বাঙ্গের রেখায় রেখায় সন্দেহ আর বিদ্রোহ যেন নীলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে উদ্যত হয়ে আছে। রাত কেটে গেল খুকুর চিলেকোঠার ঘরে। অগত্যা নীলারও কাটল খোলা ছাতে মাদুর পেতে শুয়ে। আর রীতিমত শঙ্কিত হল নীলা, পরদিন যখন সেই ঢাকাই শাড়িখানা পাট করে তুলে রাখতে এসে দেখল, সেটাকে কে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কেটে ফালি ফালি করে রেখেছে।

পরিবেশ সৃষ্টি করবার অবকাশ আর নেই। অবকাশ নেই রইয়ে-সইয়ে বলবার। বিশ্বজিৎ বলেছে এখানে থাকবার সাহস ওর আর নেই, আজ রাত্রেই রওনা দিতে হবে। অতএব আচমকাই বলতে হবে।

খুকু, আজ আর স্কুলে যাস নি।

কী হয়েছে?—ভুরু কুঁচকে তাকাল খুকু।

বলছি আজ আর স্কুলে যাস নি, অনেক কথা আছে, আছে অনেক কাজ।

আমার সঙ্গে কারও কোনও কথা নেই, কোন কাজও নেই।

কৈশোর ছাড়িয়ে খুকু কি যৌবনে পৌঁছল সহসা?

আছে কথা, আছে কাজ।—নীলা ধমকের ভান করে: আজ রাত্রের গাড়িতে আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হবে—

খুকু সহসা মুখ ফিরিয়ে ঠিকরে ওঠে। দুই চোখে জ্বলে ওঠে সন্দেহ, ব্যঙ্গ আর ঘৃণার আগুন।

তোমার যেতে ইচ্ছে হয়, তুমি যাও গে, আমি কী করতে যাব?

কী? কী বললি? বল্, কী বললি?

উদ্ধত স্বরে খুকু বলে, আমি যাব না।

রাগ করছিস কেন খুকু? কান পেতে শোন্ না আমার কথাটা। কাছে আয়।

এখান থেকেই বেশ শুনতে পাচ্ছি, বল না কী বলবে?

যাকে দেখে অত রাগ করছিস, যার সঙ্গে যেতে চাইছিস না, সে কে জানিস?

জানি না। জানতে চাই না।—বলে খুকু জুতোয় পা গলায়।

শোন্ খুকু, চলে যাস নি। ও আমাদের সবচেয়ে আপনার লোক, ও তোর—

কখ্খনো না,—ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত ফুঁসে ওঠে তেরো বছরের খুকু : কখ্খনো না। ও আমাদের কেউ না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি মিথ্যে কথা বলবে, বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে। বিলাসীর মত বোকা নই আমি।

বইখাতাগুলো উঠনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায় খুকু। আর স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে নীলা খোলা দরজার দিকে। উত্তপ্ত নিশ্বাসে কান মাথা আগুন হয়ে আসে, সমস্ত শরীর থরথর করতে থাকে।

বিশ্বজিৎ এত কথার কিছুই জানে না। গা-ঢাকা দেবার পক্ষে সুবিধাজনক ভেবে চিলেকোঠায় আশ্রয় নিয়েছে সে সকালবেলাটা।

.

শহরের পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার অপবাদ সর্বজনবিদিত, মফস্বলের পুলিস চৌকিদাররা তো দারুব্রহ্ম, তবু দারুব্রহ্মেরও টনক নড়ে, বালিকা একটা মেয়ে যদি দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসে আর সে মেয়েটা যদি ওদের চেনাজানা হয়। স্কুলে যাবার পথে থানা। যেতে আসতে দু বেলা ওর কোল মাড়িয়ে হাঁটতে হয় খুকুকে। ছেলেবেলায় কত আদর করেছে ওই বুড়ো চৌকিদারটা। হ্যাঁ, সেই মেয়ে যদি উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে বলে, আমাদের বাড়িতে একটা বদমাস লোক ঢুকে পড়েছে, আমার মা একা আছেন, শিগগির চল তোমরা, তখন একটু নড়াচড়া করতে হয় বইকি। আর সত্যি যুদ্ধ দাঙ্গা সব কিছু মিটে যাবার পর বড় বেশী মিইয়ে গেছে তাদের কাজকর্ম, তবু একটা খোরাক জুটল। একা একজন মহিলার বাড়তে বদমাস লোক ঢুকে পড়ার ফয়সালা করার মত পছন্দসই খোরাক।

খুকু আর উদ্‌ভ্রান্ত নেই। আত্মস্থ হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। হ্যাঁ, মাকে রক্ষা করতে হবে তাকে। এ-দায়িত্ব খুকুরই।

কিছুতেই মাকে উচ্ছন্ন যেতে দেবে না সে।

কে? কে?

চমকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল নীলা। উঠনে গোটা তিন-চার লাঠিধারী পাহারাওলা, আর রক্তমুখী খুকু।

কোথায়! ডাকু বদমাস কোথা?

খুকু নিঃশব্দে চিলে কোঠার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখায় শাণিত ছুরির নির্মম দৃষ্টি নিয়ে।

•

মফস্বলের নিজস্ব সংবাদদাতা সংবাদটা পাঠায় ধীরে-সুস্থে। সে-খবর শহরের খবরের কাগজে ছাপা হয় আরও ধীরে-সুস্থে। 'অমুক জেলা'য় নানা সংবাদের মধ্যে ছাপা হয় এক 'চাঞ্চল্যকর সংবাদ': "দিবা দ্বিপ্রহরে জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর উপর দুর্বৃত্তের আক্রমণ। বালিকা কন্যার প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বে জননীর সম্ভ্রমরক্ষা।" অতঃপর পুলিসের কৃতিত্বের একটি জোরালো কাহিনী বর্ণনান্তে জানানো হয়, "জানা যায়, উক্ত দুর্বৃত্ত একজন পলাতক খুনী আসামী, পুলিস বহুদিন হইতে তাহার সন্ধান করিতেছিল।"

এর থেকে বেশী কথা সংবাদপত্র বলে না।

এর পরের কথা বলার দায়িত্ব নীলার কাহিনীকারের। কিন্তু বলবার আর আছেই বা কী? এখন তো নীলা নিত্যনিয়মে সাদা লংক্লথের উপর নরুনপাড় ধুতি জড়িয়ে সেলাই-স্কুলে যাতায়াত করে, এখন নিত্যনিয়মে তাড়া-তাড়ি করে খুকুর স্কুলের ভাত বাঁধে। গোটা কয়েক দিন ওকে নিয়ে পাড়ায় যে হাসাহাসি উত্তেজনা আর সমালোচনা চলেছিল, সেও ঠাণ্ডা মেরে গেছে।

সত্যি কথাটা আজ পর্যন্ত আর খুকুকে বলা হয়ে ওঠে নি নীলার। কিন্তু বলে লাভই বা কী? বিশ্বাস করাতে না পারলে বানিয়ে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে মায়ের উপর ঘৃণা আরও বাড়বে খুকুর। বিশ্বাস করাতে পারলে বাপের উপর জন্মাবে ঘৃণা। তা হলে ও-বেচারারই বা আশ্রয় কোথা?

চির-আশ্রয়টা তো ধসেই গেছে। মায়ের আর খুকুর মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে এক পাথরের প্রাচীর।

হয়তো এমনি করেই জগতের অনেক সত্য কথা মিথ্যার জগদ্দল পাথরের নীচে চাপা পড়ে থাকে, এমনি দ্বিধার জন্যই অনেক সত্য কথা অনুক্ত থেকে যায়। মানুষের হাতে প্রতিকার নেই, তাই তারা শুধু আর-একটু রোগা হয়ে যায়, আর-একটু কোলকুঁজো হয়ে পড়ে।

॥ অনুপমার ঘর ॥

অনুপমার বয়সটা যদি পঞ্চাশ-বাহান্ন ধরিয়া লওয়া যায়, তবে নববধূর ভূমিকায় অনুপমাকে দেখিতে চাহিলে আপনার দৃষ্টির সীমানাকে বছর চল্লিশ পিছাইয়া দিতে হয়।

যবনিকা উত্তোলন করিতেই চোখে পড়িবে নবদম্পতির শয়নকক্ষের দৃশ্য। না না, অত কুণ্ঠিত হইবার কিছু নাই, বাপের বাড়িতে পুতুল খেলানাগুলা ফেলিয়া আসার শোকে এই কিছুক্ষণ আগেও ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়াছে অনুপমা।

ঘটনাটা ঘর-বসতের দিনের।

'দিন' নয়, রাত্রির।

অষ্টাহের স্মৃতিটা তো ছায়ামাত্র। কতকগুলা এলোমেলো মানুষের ভিড় আর অর্থহীন গোলমাল ছাড়া আর-কিছুই মনে পড়ে না হীরালালের, তাই উৎসুক আগ্রহে এক বৎসর যাবৎ এই দিনটির প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে সে। হীরালালের বয়সটাও অবশ্য মারাত্মক নয়, কিন্তু ঔৎসুক্য বলিয়া যে একটা বস্তু আছে সে বয়সটা হইয়াছে।

বছর না ঘুরিতেই 'ধুলোপায়ে ঘর-বসতে'র প্রথা তখনও বিশেষ চালু হয় নাই। হীরালালদের খুঁতখুঁতে বাড়িতে আবার দেখাসাক্ষাৎ পর্যন্ত নিষিদ্ধ। শ্বশুর-বাড়ি নিমন্ত্রণ যাওয়া অবধি বেআইনি।

বিবাহের কনে বদল করিয়া ঘর-বসতে অন্য মেয়ে চালান দিলেও হীরালাল ধরিতে পারিত কি না সন্দেহ। কাজেই আপাতত হীরালালের কাছে বউ সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু এমন স্মরণীয় রাত্রে নূতন বউ যে ব্যবহারটা করিল সেটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

আশা-আনন্দ-শঙ্কা-ভয়-মিশ্রিত অনাস্বাদিত হৃদয়াবেগের ভারে তরুণ হীরালাল যখন কথা বলিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না, তখন নিতান্ত বালিকা অনুপমা ঘোমটা নামাইয়া পাকা গিন্নীর ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, তোমাদের বাড়িটা কী বিচ্ছিরি, মা গো! একখানা বাড়িতে গাদাগাদি

করে পঞ্চাশটা লোক! দেখলে যেন প্রাণ হাঁফিয়ে আসে, উঃ! আমি কিন্তু বাবু আগে থাকতে বলে রাখছি 'ভেন্ন' হব।

দৃশ্যত হীরালাল যেমন বসিয়া ছিল তেমনি 'কাঠ মারিয়া' বসিয়া থাকিল বটে, কিন্তু তাহার নিজের মনে হইল, কে যেন তাকে তুলিয়া ধরিয়া সশব্দে আছাড় মারিয়াছে।

ঘর-বসতের কনের মুখে এই কথা!

বাহিরে 'আড়ি-পাতুনী'দের উপস্থিতি স্মরণ করিয়া শুদ্ধ বাংলায়—'সর্বাঙ্গ ডোল' হইয়া উঠিল হীরালালের। অথচ সে বেচারা সম্বিত ফিরিয়া পাইবার আগেই নূতন বউ তাহার সম্পূর্ণ মতামত ব্যক্ত করিয়া ফেলিল, ছোট্ট একটি নিরিবিলি বাড়িতে নিজের ইচ্ছেমতন সাজালাম গোছালাম, ফিটফাট থাকল—তা নয়, এ যেন বারো মাসই রথদোলের হুল্লোড়!

হীরালাল পূর্ব-পরিকল্পিত সমস্ত কাব্যিক ভাষা ভুলিয়া বিরক্ত কণ্ঠে কহিল, তুমি তো মোটে আজ একদিন এসেছ, বারো মাসের খবর জানলে কী করে?

জানব না কেন? বড় সংসার দেখতে তো আর বাকী নেই, আমার নিজের মামার বাড়িই তো দেখেছি। কিছু যদি সভ্যতা-ভব্যতা আছে কারুর! দিনরাত্তির খালি গরুর মতন খাচ্ছে আর রাঁধছে, রাঁধছে আর খাচ্ছে।

নববধূর ভাষা-মাধুর্যে চমৎকৃত হীরালাল হতাশ ভঙ্গিতে হাসিয়া ফেলিয়া বলে, গরুরা অবশ্য গরুর মতই খায় বটে, তবে রাঁধেও নাকি? কই, শুনি নি তো কখনও? তোমার মামার বাড়ির দেশে বুঝি—

ওই হল।—অনুপমা এইবার একটি অনুপম হাসি হাসিয়া উত্তর দিল, গরুর মতন না হয় ভূতের মতন। না, তাও হয়তো বলবে 'ভূতেরা রাঁধে, কই শুনি নি তো?'—হি-হি-হি! কিন্তু সত্যি সত্যি, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, নিজের একখানি আলাদা বাড়ি থাকবে, এমনি বিয়ে হওয়া আমার বরাবরের সাধ। তা ভগবান দেখছি আমার ভাগ্যে ঠিক উল্টোটি লিখে বসে আছেন, এখন আলাদা হওয়া ছাড়া উপায়?

নিরুপায়ের ভঙ্গিতে দুই হাত উল্টায় অনুপমা।

মামার বাড়িটা যতই অরুচিকর হোক, এই বয়সে এমন রুচিসম্মত বাক্য-

বিন্যাসপ্রণালীটা যে অনুপমা মাতুলালয়ের সূত্রেই পাইয়াছে সে বিষয়ে আর ভুল নাই।

এই ইঁচড়েপক্ক বউটিকে লইয়া ভবিষ্যৎ জীবনটা কিরূপ হইবে অতদূর ভাবিয়া উঠিতে পারে না হীরালাল, শুধু বাহিরের তীক্ষ্ণ কানগুলির কথা স্মরণ করিতে করিতে বারে বারে কণ্টকিত হইতে থাকে।

গোড়া-পত্তনটা এই।

বারো বছরের অনুপমা নিজস্ব একটি ছোট্ট সংসার আর ছবির মত একখানি বাড়ির স্বপ্ন লইয়া শ্বশুরঘর করিতে আসিল। আর আঠারো বছরের হীরালাল এ যাবৎ পাঠ্য অপাঠ্য যত কিছু বই হইতে যা কিছু কাব্যরস সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত শিকায় তুলিয়া রাখিয়া কিশোরী প্রিয়ার কাছ হইতে অভিনব জ্ঞান সঞ্চয় করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, উক্ত 'ঘর-বসতে'র পরদিন নূতন বউয়ের নামে 'টি-টি'কার পড়িয়া গিয়াছিল। আড়ি পাতিবার জন্য যাহারা শীতের রাত্রে নিউমোনিয়ার আশঙ্কা তুচ্ছ করিয়া ঘণ্টা দুই-তিন জানালার বাহিরে কান পাতিয়া খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া থাকিয়াছে, আর যাই হোক, এতটা আশা করে নাই তাহারা। নববধূ কান্নাকাটির পরিবর্তে বড়জোর 'বাচাল' বা 'বেহায়া' নাম কিনিবার উপযুক্ত আচরণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কাহাকেও 'ভেন্ন' হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শোনা যায় নাই। আড়ি-পাতুনীদের পক্ষে এটা সম্পূর্ণ নূতন অভিজ্ঞতা।

নূতন ডুরেশাড়ি, মল আর নোলক পরা টুকটুকে বউটি, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যাইবার কথা। কিন্তু সকালবেলা বউ দোতলা হইতে নামিয়া আসা-মাত্র আপাদমস্তক জ্বালা করিয়া উঠিল শাশুড়ী ঠাকুরানীর। অর্থাৎ রাতা-রাতিই দূত মারফত বউয়ের গুণাগুণ জানিয়া ফেলার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের, বোঝা গেল।

আপন মনে নীচে নামিয়াই শাশুড়ীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ঘোমটার বহর বাড়াইয়া দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল অনুপমা।

শাশুড়ী ত্রিপুরাসুন্দরী একটা ছুতা পাইলেন যেন। মুখখানা যতটা বিকৃত করা সম্ভব করিয়া মুখঝামটা দিয়া উঠিলেন, আহা, মরে যাই, আমায় দেখে আবার ঘোমটা! তবু যদি না ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচ হত! সেই বলে না—'লাজে বউ খান্ খান্, ঘোমটার ভেতর খ্যাজা খান, এ যেন

তাই। বলি, বাপের বাড়ি থেকে খুব শিক্ষে শিখে এসেছ তো বাছা!

দাদারও দাদা থাকেন, কাজেই শাশুড়ী থাকা অসম্ভব নয়, তবে খাঁটি শাশুড়ী নয়—খুড়শাশুড়ী। কাজেই শাসনকর্তা নন, বড়জোর কুটুস্‌কামড় করিতে পারেন। ত্রিপুরাসুন্দরীর খুড়শাশুড়ী মহেশ্বরী একটা রসালো ঘটনার আভাস পাইয়া পুলকিত চিত্তে বাহিরে আসিয়া কহিলেন, ও কী মেজবউমা, সকালবেলাই ছেলেমানুষকে ভয় খাইয়ে দিচ্ছ কেন বাছা? আহা, যতই হোক, কচি শিশু, মা বাপ ছেড়ে—

কথা শেষ হইবার আগেই ত্রিপুরা ঝঙ্কার দিয়া উঠেন, থাক্ ছোটখুড়ি, তুমি আর ফোড়ন কেটো না, আমি বলে নিজের জ্বালায় জ্বলছি।···ছেলে-মানুষ! কী আমার ছেলেমানুষ রে! ওই ছেলেমানুষ আমার হীরুকে এক হাটে বেচে আর-এক হাটে কিনবে তা দেখো। ওমা, বাবার জন্মে শুনি নি যে ঘর-বসতের বউ এসে বলে 'ভেন্ন হব'।

মহেশ্বরীও সে খবরটা না পাইয়াছেন এমন নয়, কিন্তু অজানার ভান বজায় রাখিয়া বলেন, কী হবে? কী বলেছে?

ভেন্ন হবেন গো—বর নিয়ে আলাদা হবেন। শুনেছ এমন কথা?

ওমা, সে কী কথা!···হ্যাঁ গা নাতবউ, এসব কী কথা?

বেচারা অনুপমা হীরালালের সামনে যতই প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করুক, পুলিস-কমিশনার আর জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট উভয়কে একত্রে দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া ঠিক একই অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে।

ত্রিপুরার উনানের আগুন বহিয়া যাইতেছে, দাঁড়াইয়া কথা শুনিবার সময় নাই, তাই জ্বলন্ত উনানের মতই মুখচ্ছবি করিয়া বলেন, বেঁচে থাকলে আরও কত শুনবে ছোটখুড়ি, এখনই হয়েছে কী? ওমা, আমি কোথায় যাব! ভাবছি, আর যেন জলবিছুটি দিচ্ছে গায়ে!

জলবিছুটির জ্বালাতেই ছটফট করিয়া বোধ করি তাড়াতাড়ি চলিয়া যান ত্রিপুরাসুন্দরী।

অতঃপর ননদ আর ভাজ, পিসশাশুড়ী আর মাসশাশুড়ী, ভাগ্নী আর ভাসুরঝির দল, একে একে দুইয়ে দুইয়ে আসিয়া অনুপমাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শ্লেষ এবং সদুপদেশের তীক্ষ্ণ শরজালে জর্জরিত করিয়া যাইতে থাকে।···

এই বারো বৎসর বয়সে অনুপমা প্রথম টের পাইল যে তাহার নিজের মনটা কত কুটিল, বুদ্ধিটা কত প্যাঁচালো আর স্বভাবটা কত নীচ। ছেলেবেলা হইতে এইরকম কথার বাঁধুনির জ্বালায় 'গিন্নীবুড়ী' 'পাকাবুড়ী' প্রভৃতি বিশ্লেষণ বিলক্ষণ জুটিয়াছে তাহার—এ কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সে সব সম্বোধনের মধ্যে এমন তীব্র ঘৃণার ভাব তো ছিল না।

'ভেন্ন' হইবার কথাটা বলা যে নিতান্ত দোষণীয় সে বিষয়ে অবশ্য আর সন্দেহ থাকে না অনুপমার, কিন্তু তবুও চিরকাল এই 'রাক্ষসপুরী'তে থাকিতে হইবে মনে করিয়াই ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয় তাহার।

এক্ষেত্রে আলাদা হইবার ইচ্ছাটাই মনে মনে বদ্ধমূল হওয়া ছাড়া উপায় কী? অদূরভবিষ্যতে না হোক, সুদূরভবিষ্যতেও একদিন কি সুযোগ মিলিবে না?

অতএব দিনের বেলায় যতই ভীত ত্রস্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠুক অনুপমা, রাত্রে হীরালালের কাছে নিজমূর্তি ধরিতে ছাড়ে না।

হীরালাল কখনও হাসে, কখনও বিব্রত হয়, কখনও বিরক্ত হইয়া বলে, তোমার মতন অদ্ভুত মেয়ে আমি কখনও দেখি নি, খালি 'একালষেঁড়েপনা।' একলা সংসার করার এত সাধ কেন? পাঁচজনের সংসারই তো ভাল।

অনুপমা ছলছল চোখে বলে, হ্যাঁ, ভাল তো কত, খালি এক শো লোকের বকুনি খাও, আর দু শো লোকের মন জুগিয়ে চল! নিজের ইচ্ছের কিছুটি করবার জো নেই।

এখুনি আবার তোমার এত নিজের ইচ্ছে কিসের?—হীরালাল হাসিয়া ফেলে।

বাঃ, ইচ্ছের আবার এখুনি-তখুনি কী? কোন কিছু ইচ্ছে করে না মানুষের? এই তো সেদিন পানের বাটাগুলো ময়লা হয়ে রয়েছে বলে পিসিমাকে বললাম—'পিসিমা, বাটার সাজগুলো মাজব, একটু তেঁতুল দিন না,' পিসিমা অমনি বলে দিলেন—'তোমায় আর অত গিন্নীত্ব করতে হবে না বাছা, পান সাজছ পান সাজ।' আচ্ছা, আমি কী মন্দ কথা বলেছি?

বলা বাহুল্য, কোন তরুণ স্বামীরই এসব তুচ্ছ সাংসারিক কথায় কান দিতে ইচ্ছা হয় না, তা ছাড়া প্রতিকারের কোন উপায়ই যখন হাতে নাই। কিন্তু কান দিতে হয় অপর এক কারণে। কারণ, দেওয়ালের যে কান আছে এ কথা

অনুপমা না জানুক হীরালাল তো জানে। সেই কথা বলিয়াই বধূকে সাবধান করিয়া দেয় সে।

অনেক অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে অনুপমারও সঞ্চয় হইয়াছে, তাই কিছুটা সাবধান হয় এবং মনে মনে এমন একখানি ঘরের ধ্যান করিতে থাকে যে ঘরের জানালা খুলিয়া রাখিয়াও স্বচ্ছন্দে শোওয়া যায়, গলা খুলিয়া দুইটা কথা কহা যায়।

হায়! তেমন একখানি ঘর কবে জুটিবে অনুপমার?

অনুপমা যদি নেহাত নীরস গল্পকারের হাতে না পড়িয়া কবির হাতে পড়িত, তবে হয়তো 'পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা'র মত প্রিয়তমের কণ্ঠলগ্ন হইতে পাইলেই ধন্য হইত, এবং নিরালা ঘর একখানি যদি কামনাও করিত—সে কেবল বাজে লোকের কৌতূহলী দৃষ্টিপাতের আশঙ্কায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিতান্তই পনরো বছরের মেয়ে অনুপমা প্রিয়তমের দিকে পিঠ ফিরাইয়া শুইয়া মনে মনে একখানি নিরিবিলি ঘরের ধ্যান করিতে থাকে—এই সব ঘরগৃহস্থালীর কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে না পারার খেদে, ইচ্ছামত সাজাইতে গোছাইতে না পাওয়ার খেদে।

শুধুই তো একখানি নিরালা ঘর নয়—অনুপমার যে আরও অনেক কিছু চাই। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, ঠাকুরঘর, গোয়ালঘর—ঘর আর গৃহস্থালী।

মাটির যে খেলাঘরখানা ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে, সেই ঘরের জন্য হয়তো এখনও মন কেমন করে অনুপমার। তাই নিজের ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্য চাই ঘরকন্না। সে ঘরে হীরালাল কেন্দ্র নয়, পরিজন মাত্র—অনুপমার সংসারটি গড়িয়া তুলিবার জন্য একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। বাস্, আর বেশী কিছু নয়। সে ঘর একান্তই অনুপমার। কিন্তু কোথায় ঘর?

২

স্বভাববশে মাঝে মাঝে নিন্দামন্দা, টিকাটিপ্পনি করিলেও মহেশ্বরী দেবী লোক মন্দ নয়। অন্তত ভয়ঙ্কর নয়। ছোটঠাকুমার কাছে বেশ একটু প্রশ্রয় আছে অনুপমার। মাঝে মাঝে মুক্তির আস্বাদও পাওয়া যায় তাঁহার কৃপায়।

নিঃসন্তানা বালবিধবা মহেশ্বরীর সংসারের তিন ভাগ খাটুনি খাটিয়া দিয়াও অনেক অবসর, কাজেই বাঁধা নিয়মে পাড়া-বেড়ানোটি চাই তাঁহার। মাঝে মাঝে তিনি অনুপমাকে সঙ্গী করেন। হয়তো পাড়ায় কাহারও ঘরে নূতন

খোকা হইয়াছে, কি কোন মেয়ে শ্বশুরঘর হইতে আসিয়াছে, অথবা কোন কনেবউ শ্বশুরঘর করিতে আসিয়াছে, এমনি সব সাধারণ উপলক্ষ। তবু মহেশ্বরী অনুপমাকে দেখাইতে লইয়া যান।

বলা বাহুল্য, ত্রিপুরাসুন্দরী এসব দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, 'বউমানুষ ঘট্ ঘট্ করিয়া পাড়া বেড়াইবে কী'; কিন্তু খুড়শাশুড়ীকে নিষেধও করিতে পারেন না মুখের উপর। খুঁত খুঁত করেন, কাজের অজুহাত দেখান, কিন্তু সে সব মহেশ্বরীর উড়াইয়া দিতে দেরি হয় না। স্পষ্ট করিয়া তো আর ত্রিপুরাসুন্দরীর কাছে অনুমতি চাওয়া যায় না, যতই হোক মান-মর্যাদা তো আছে তাঁহার। অথচ একেবারে না জানাইয়া যাওয়া চলে না। তাই গলা তুলিয়া অনুপমাকেই ডাক দেন—অ নাতবউ, যাবে তো চল আমার সঙ্গে, বলেছিলাম না আমার বোনঝির বাড়ি দেখিয়ে আনব? আজ সময় রয়েছে—

ঘরের ভিতর হইতে ত্রিপুরাসুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া মনে মনে বলেন, কবে যে তোমার সময় নেই তাও জানি নে। বউটাকে দিন দিন পাড়া-বেড়ানী ধিঙ্গি করে তুলল গো, ছি ছি! এ যেন ইচ্ছে করে শত্তুরতাই সাধা। একে তো গুণের নিধি বউ আমার, তার ওপর আরও দজ্জাল হোক।

মনে মনে অনেক তীব্র তীক্ষ্ণ আর কটু মন্তব্য করিলেও বাহিরে কিছু আর বেশী বিরক্তি প্রকাশ করা ভাল দেখায় না, তাই ত্রিপুরাসুন্দরী নিতান্ত বিরস কণ্ঠে বলেন, তোমার বোনঝির বাড়ি বউমা আর গিয়ে কী করবে? চেনে না, জানে না।

মহেশ্বরী হাসিয়া ওঠেন: মেজাবউমার এক কথা। দেখাসাক্ষাৎ হলে তবে তো চেনা জানা হবে। সুধার বড্ড সাধ বউমার সঙ্গে আলাপ-সালাপ করে।

ত্রিপুরাসুন্দরী বিরক্তি গোপন করিতে অক্ষম হন, বলিয়া উঠেন, তা সেও তো একদিন বেড়াতে এলে পারে! বউমা বউমানুষ, নিত্যি ধেই ধেই করে এখান ওখান কী যাবে!

চটিয়া গিয়া কাজ নষ্ট করিবার লোক মহেশ্বরী নয়, তাই আরও একবার হাসিতে হয় তাঁহাকে: বলি সেও তো একটা মানুষের বাড়ির বউ—না কী? তবে হ্যাঁ, আসবে, সেও আসবে। সময় তো পায় না বাছা। চব্বিশ

ঘণ্টা কাজ, শাশুড়ী মাগী চোখে ভাল দেখতে পায় না, কিছু করে না, সব ওই সুধা।...কই গো নাতবউ, তোমার সেই গোলাপী শেমিজ আর গঙ্গাজলী ডুরেখানা পরে এস। নতুন দেখবে ওরা। চুলটা তোমাদের যেমন ফ্যাশন-ট্যাসান কাটে কেটে নাও। যেমন-তেমন করে লোকের বাড়ি যাওয়া ভালবাসি না।

তা বাসবে কেন, বউ বিবি সেজে পথে পথে রূপ দেখিয়ে বেড়াবে!—অস্ফুট মন্তব্য করেন ত্রিপুরা।

হীরু এবার বাড়ি আসুক যা হয় একটা বিহিত তিনি করবেনই। ছোটখুড়ি যে বউটিকে বিগড়াইয়া দিবেন সেটা কিছু কাজের কথা নয়। বাড়িতে আরও পাঁচটা বউ আছে, তাঁহার নিজের নয় বটে, ভাসুরপো-বউ, ভাগ্নে-বউ ইত্যাদি—তাদের জন্য তো মাথাব্যথা নাই ছোটখুড়ির। বলিলে বলিবেন—ও ছুঁড়ীরা উদয়াস্ত ব্যস্ত, কুচো-কাচা নেড়ি-গেঁড়ি নিয়ে কোথায় যাবে? এ বউটারও তো কই এখন ছেলেপুলে হল না! পনরো-ষোলো বছর বয়স হল, কম তো নয়, এ বছরটা দেখি, এর পর মাদুলি দিতে হবে একটা। কোলে কচি না হলে জব্দ হবে না বউ।

বউকে জব্দ করিবার অনেক ফিকির খুঁজিয়া বেড়ান ত্রিপুরাসুন্দরী। কিন্তু সুপারি কাটা, তেঁতুল ছড়ানো, নারকেল কোরা, চাল ডাল বাছা প্রভৃতি কুড়ে কর্ম দিয়াও জব্দ করিতে পারেন না, চক্ষের নিমিষে কাজ শেষ করিয়া ফেলে অনুপমা।

বউ আবার অত চটপটেও ভাল নয়।

ত্রিপুরাসুন্দরী রাগে গস গস করিতে থাকিলেও গোলাপী সেমিজ আর গঙ্গাজলী ডুরে শাড়ি জড়াইয়া দিদিশাশুড়ীর পিছু পিছু চুপ করিয়া বাহির হইয়া যায় অনুপমা।

বেশ খানিকটা দূরে সুধার শ্বশুরবাড়ি।

বড় দীঘির ধার দিয়া যাইতে হয়, বেশ খোলামেলা জায়গাটা। চলিতে চলিতে উৎফুল্ল আনন্দে ঘোমটাটা ঈষৎ সরাইয়া অনুপমা ফিস ফিস করিয়া বলে, ছোটঠান্‌দি, এদিকটা তো দিব্বি। আমাদের বাড়িটা যেন ঘিঞ্জি এঁদো পাড়ায়।

মহেশ্বরী বলেন, তা যা বলেছিস। সুধাদের এদিকটা বেশ।

আচ্ছা ঠান্‌দি, এত জমি পড়ে আছে—এসব কাদের ?

এদিকটা মনসা ভট্‌চাযির। আর ওই দীঘির ওপাড় থেকে চোধুরীদের। যত দূর দিষ্টি যায় সব ওদের।

অনুপমা বিস্ফারিত চক্ষে যত দূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া বলে, হ্যা ঠান্‌দি, সব ওদের ? এত জমি এমনি ফেলে রেখেছে ?

তা কী করবে ? এ সব তো ধান-জমি নয়। ফলের বাগান ছিল আগে, দেখাশোনার অভাবে সব মরে-হেজে গেছে। কেই বা আছে আর ?

ঠান্‌দি !—অনুপমা অকারণ গোপনতায় আরও ফিস ফিস করিয়া বলে, এর থেকে একটুখানি জমি ওরা বিক্কিরি করতে পারে না ?

তা কী জানি !—মহেশ্বরী হাসিয়া ওঠেন : কেন, তুই কিনবি নাকি ?

অনুপমা অপ্রস্তুত ভাবে বলে, বাঃ, আমি কেন ? লোকে তো কিনে বাড়ি করতে পারে ?

কার গরজ পড়েছে যে এই মাঠের মধ্যিখানে বাড়ি করতে আসবে ?

কী যে বল ছোটঠান্‌দি, মাঠের মধ্যিখানে নয় তো পচা ডোবার ধারে বাড়ি করা বুঝি ভাল !

মহেশ্বরী আগাইয়া যান, অনুপমাকেও ব্যস্ত হইয়া সঙ্গ লইতে হয়, কিন্তু পিছন ফিরিয়া দীঘির পাড়ের উঁচু জমিটার দিকে বার বার লুব্ধ দৃষ্টি ফেলিতে থাকে। কতটা জমি লইলে একখানি ছোটখাট বাড়ি হয় সেই কথাটা জানিতে বার বার 'বলি বলি' করিয়াও বলিতে পারে না অনুপমা।

কতটুকু জমি ? কত দাম ? কত কাল লাগিবে অনুপমার এই ছোট প্রশ্নটুকু করিবার মত সাহস সঞ্চয় করিতে ?

সুধাদের বাড়ি ঢুকিয়াই অনুপমার মনে হইল, সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। ঠিক এমনি একখানি ছবির মত বাড়িই তাহার ধ্যানের স্বপ্ন নয় কি ? ছোট্ট খাট্ট ধবধবে শান-বাঁধানো উঠান, কাদা পাথরে বাঁধানো সুগঠিত তুলসীমঞ্চ, উঁচু রোয়াকের উপর পাশাপাশি দুইখানি ঘর, এদিকে—রান্নাঘর ভাঁড়ার-ঘর আর চাতাল। শোবার ঘরের দরজা-জানালায় পুরানো রঙিন শাড়ি কাটিয়া পর্দা লাগাইয়াছে সুধা, রোয়াকের উপর পাতিয়া রাখিয়াছে বেতের মোড়া আর নীচু টেবিল। অবশ্য টেবিল বলিলে তাহাকে একটু বাহুল্য গৌরব দেওয়া হয়, তবু চারখানা পায়া তো আছে ! শাড়ির পাড় জুড়িয়া একটা

ঢাকনি তো লাগাইয়াছে তাহাতে! পল্লী অঞ্চলে এ-হেন শৌখিনতা দুর্লভ। বিশেষ তো তখনকার আমলে।

নিস্তব্ধ বাড়ি, মধ্যাহ্নকালটি যে বিশ্রামের কাল এটা বোধ করি অস্বীকার করে না এরা। অনুপমার শ্বশুরবাড়ির মত অহরহ হট্টগোল আর অবিশ্রাম কাজের বায়নাক্কা আর কাহাদের আছে, বাবাঃ!

মহেশ্বরী ঝাঁপের বেড়াটা ঠেলিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া ডাকেন, কই রে সুধা, ঘুমচ্ছিস নাকি? এই দেখ্, কাকে ধরে এনেছি।

পর্দা সরাইয়া ঘরের ভিতর হইতে সুধা বাহির হইয়া আসে।

বাড়ির মতই ফিটফাট ছিমছাম মানুষটি। আসন্ন সন্তানসম্ভাবনায় মন্থর। বয়সে অনুপমার চাইতে কিছু বড় হওয়াই সম্ভব।

এই বুঝি তোমাব নতুন নাতবউ রাঙামাসী? ওমা, বেশ বউ তো। এস ভাই।

সহজ হৃদ্যতায় অনুপমাকে ডাকিয়া লয় সুধা।

কই রে, বেয়ান কই? তোর শাশুড়ী?

তিনি ওই ঘরে পড়ে ঘুমচ্ছেন। অথর্ব মানুষ।

যাই, দেখি একবার বুড়ীকে, তোরা গল্পসল্প কর্। নাঃ, দোরে আবার ন্যাকড়ার পর্দা লাগিয়েছে, যত সব বিবিয়ানা! সরা দিকিন বাপু। বুড়ীর ঘরে আবার এসব কেন?

সুধা হাসিয়া পর্দা সরাইয়া দিয়া বলে, বুড়ীর ঘর বলে বাদ দিলে বাড়ির সৌষ্ঠব হবে কেন গো রাঙামাসী? এসব ভাল গো ভাল, আকাচা কাপড়ে ছুঁই না আমরা, উল্টে রাখি তখন।

মহেশ্বরী সরিয়া যাইতেই সুধা অনুপমার গালটা টিপিয়া দিয়া বলে, ইঃ, পাকা ডালিম, বর খুব ভালবাসে তো? কিছু মনে কোর না ভাই, যদিও তুমি মাসীমার নাতবউ, সম্পর্কে এক পৈঠে নীচে, তা হলেও সমবয়সীদের মধ্যে ওসব সম্পর্ক-টম্পর্ক বাছতে পারি নে বাপু।

অনুপমা হাসিয়া বলে, আমিও। আচ্ছা, তোমার শাশুড়ী তো অথর্ব মানুষ, একলাটি তোমার খুব কষ্ট, না?

সুধা একটু রহস্যময় হাসির সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, এক রকম কষ্ট, আবার এক রকম সুখ। মাথার ওপর কথা কইতে তো কেউ নেই। যা করব আমি। এই যে বাড়িঘর সব আমার পছন্দে, শ্বশুরের তো একখানা ভাঙা ভিটে ছিল

ওই ওদিকে—ভাঙাচোরা দেখতে পারি নে বাপু। হ্যাঁ, বনে গিয়ে সন্নিসি হও আলাদা কথা, আর সংসার যদি করতে হয় সংসার করার মত কর।

অনুপমা ফিকে হাসি হাসিয়া বলে, বরটি তোমার কথা শোনেন, তবে না?

শুনবে না মানে? অমনি নাকি? নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব না তা হলে? এই তো, দেখছ তো অবস্থা? আগে থেকে বলে দিয়েছি বেতের দোলা কিনে আনবে আর রঙিন মশারি, এই দালানে টাঙিয়ে দেব।

সোহাগে গর্বে টলটল করিতে থাকে সুধা।

গৌরব করিবার মত ঐশ্বর্য থাকিলেই বোধ করি এত সহজ অমায়িক হইতে পারে মানুষ।

সুধার উপর কেমন এক ধরনের হিংসা হয় অনুপমার। মনে হয় ওর কথাবার্তার মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার, ওর আসন্নমাতৃত্বের ভারে ভারাক্রান্ত শরীরটাও যেন নিজের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তেমন খোলা মনে আর কথা কহিতে পারে না অনুপমা, শুধু আড়ে আড়ে চাহিয়া সব দিক দেখিয়া লয়।

বড় চৌকির উপর ফরসা ধবধবে বিছানা পাতা, ঝালর-দেওয়া বালিশ, মশারিতে রঙিন ঝালর। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি ছবি, গ্রুপ ফোটো, কালীঘাটের পট, একখানা মেলিন্‌স্ ফুডের খোকার ছবি। সেল্‌ফের উপর টেবিল-ল্যাম্প, কাচের পুতুল, আরশি চিরুনি, আর কত কী টুকিটাকি।

এ সব তো এবার থেকে সাবধান করতে হবে।—অনুপমা বাঁকা হাসির সঙ্গে অনাগত শিশুর দুরন্তপনার ইঙ্গিত করে।

ইস্, সাবধান করতে হবে বইকি। ছেলে ধরবার লোক রেখে না দিলে রক্ষে রাখব কিনা! তা ছাড়া, দোতলায় এবার ঘর তোলা হবে।

দোতলায়!—অনুপমা চকিত হইয়া বলে, আর ঘরের তোমাদের দরকার কী?

ওমা, শোন কথা। চিরকাল বুঝি নীচের তলায় পড়ে থাকতে ভাল লাগে? আমি তো বলে দিয়েছি—এই যাচ্ছি বাপের বাড়ি, ছ মাস পরে আসব, এসে যেন দোতলায় শুই

তোমার বর কী করেন ভাই?

উনি? কিছু না, ভেরেণ্ডা ভাজেন।—সুধা হাসিয়া ওঠে: আমি তো বলি 'কন্‌ট্রাক্টারি' করাও যা ভেরেণ্ডা ভাজাও তা। তবে হ্যাঁ, কাঁচা পয়সা আছে।

কুড়ি বছরের সুধা কথা কয় যেন পাকা গিন্নীর মত।

বাচাল বলিয়া যে এত অখ্যাতি অনুপমার, সুধার কাছে যেন বোকা বানিয়া যায়।

খুব আন্তরিকভাবে না হইলেও গল্পসল্প হয় খানিকক্ষণ। এই বাড়ি করিতে কত খরচ হইয়াছে, দোতলা তুলিতে কত লাগিবে, পুরানো ট্রাঙ্কগুলার নতুন রঙ লাগাইয়া সত্যই নতুনের মত লাগে কি না, এত ছবির ফ্রেম কিনিতে কতগুলি টাকা খসিয়াছে সুধার বরের—এমনি সব নিরেট আলোচনা।

এর চাইতে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চালাইবার মত বুদ্ধিবৃত্তি দুইজনের কাহারও নাই।

ফিরিবার পথে অনুপমা যেন কেমন গম্ভীর হইয়া পথ চলে। সংসারের চাপে, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় যে বাসনাটা ভোঁতা হইয়া আসিতেছিল সেটা যেন নূতন করিয়া মাথা তোলে। সুধার কথাগুলা দেমাকে ভরা বটে কিন্তু খাঁটি, এটাও মিথ্যা নয়: 'সংসার যদি করিতে হয় সংসারের মতই করা ভাল।'

সুধার ঘর-সংসার গোছানো ফিটফাট বটে, কিন্তু অমন একখানি ছবির মত বাড়ি এমন হাতের মুঠার মধ্যে পাইলে অনুপমা যে আরও কত কী করিতে পারিত তা দেখাইয়া দিবার সুযোগ কবে জুটিবে অনুপমার!

বাড়ি! বাড়ি!

পনরো বছর বয়সের মেয়ে শাড়ি চায় না, গয়না চায় না, স্বামীর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয় না, চায় কিনা বাড়ি! আশ্চর্য বটে! কিংবা হয়তো আশ্চর্যও নয়, বাড়ি মানে তো কেবলমাত্র একটা ইট-কাঠের সমষ্টি নয়, নিজেকে প্রকাশ করিবার একটা সহজ ক্ষেত্র, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত মন্দির।

খানিকটা পথ চলিতে মহেশ্বরী নাতবউয়ের আনমনা ভাব লক্ষ্য করেন, বাক্যবাগীশ অনুপমার হইল কী! বলেন, কী হল রে নাতবউ? কথা নেই কেন মুখে?

কই ঠান্‌দি, এই তো কথা কইছি। আচ্ছা ঠান্‌দি, 'কন্‌টাক্টারি' করা মানে কী?

ওমা, মানে আবার কী, কাজ একরকম। এই তো সুধার বরই করে। এই ধর্‌ যেমন তোর বাড়ি হবে—সুবোধ কন্‌ট্রাক্ট নিলে, কেমন? সুবোধই মিস্তিরি খাটাবে, দেখাশোনা করবে। মালমসলা কিনবে, তোর কাছে সুধু নগদ দামটি নেবে, বাস্‌। তোর আর কোন ঝামেলা থাকল না। কন্‌টাক্টারি করেই তো সুবোধের এত বাড়-বাড়ন্ত, কাঁচা পয়সা আছে কিনা, নইলে লেখাপড়া আর কী জানে! নে, চল্‌ তাড়াতাড়ি, তোর শাশুড়ী আবার হাঁড়িমুখ করে বসে আছে হয়তো।

শাশুড়ী!

দপ করিয়া যেন সমস্ত আলো নিবিয়া যায়। হায়! সুধার শাশুড়ীর ত অথর্ব শাশুড়ী যদি হইত অনুপমার! সে শুধু খাইত আর ঘুমাইত কিন্তু শুধুই কি শাশুড়ী? পিসশাশুড়ী খুড়শাশুড়ী জ্যাঠতুতো খুড়তুতো বড় বড় জা ভাসুর, কুচোকাচা গেঁড়িগুগলিতে বাড়ি বোঝাই। সুধার বাড়ির মত শান্ত শান্তি কোথায়?

আচ্ছা ঠান্‌দি, তোমার বোনঝির বাড়িটি বেশ ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা, না?

ঠাণ্ডা! আ কপাল, ঠাণ্ডা আবার ভাল? কাচ্চাবাচ্চায় ঘর ভরে যাবে, তবে না সংসার? সুধার তো এই বুড়োবয়সে 'হবে না হবে না' করে এতকালে এই আশা হয়েছে। তা নইলে এতদিনে তিন ছেলের মা হবার কথা। তা তোরও যা ধাত দেখছি—

যাঃ, ঠান্‌দি যেন কী! চল তো পা চালিয়ে।

শাশুড়ীর হাঁড়িমুখ মনে পড়তেই কল্পনার ছবি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়ে। অনুপমার বাড়ির উঠানের তুলসীমঞ্চটা শ্বেতপাথরের হইবে কি কালোপাথরের, দুইখানা ঘর থাকিবে না তিনখানা, চৌকিতে বিছানা হইবে কি বার্নিশ-করা পালঙ্কে—সে সব চিন্তা মুলতুবি থাকে।

সারাদিনের অজস্র কাজের শেষে সেই চিন্তা পাড়িয়া বসে এবং অনেক চেষ্টার ফলে প্রকাণ্ড একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলে হীরালালকে।

আঁকাবাঁকা কাটাকুটি তো বটেই, তা ছাড়া বানানের উপর বর্ণমালার

নির্দেশের চিহ্নমাত্র নাই। তা হোক, তবু মনের কথাগুলা তো স্বামীর কাছ পর্যন্ত পৌছানো গেল। যদিও একুশ বছরের স্বামীর পক্ষে কতটুকু কী করা সম্ভব, সেটুকু আর ভাবিয়া দেখে নাই অনুপমা। দুইটা পাস করিয়া যে তিনটা পাসের পড়া করিতে পারে, সে যে সুধার বরের মত সামান্য 'কন্‌টাক্টারি'টুকুও পারিবে না এটা অবিশ্বাস্য। বিশেষ তো হাতে 'কাঁচা পয়সা' আছে। এই সব কথাই বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় গুছাইয়া লেখে অনুপমা। তা ছাড়া আরও লেখে—এবারে আসিবার সময় যেন 'শান্তনু ও গঙ্গা'র একখানা ছবি আনে হীরালাল, আর দুইটা কাচের ফুলদানি। আরও অনেক ছবি অবশ্য চাই, তবে একে একে আনিলেই চলিবে।

হীরালাল কিন্তু না আনে ছবি, না আনে ফুলদানি। অনুপমা পাগল বলিয়া তো আর হীরালাল পাগল নয়। অথবা জিনিসটা অদৃশ্য করিয়া আনিয়া অনুপমার হাতে পৌছাইয়া দেওয়াও সম্ভব নয়। তা ছাড়া রবিবর্মার আঁকা ছবি টাঙাইবে কোথায় অনুপমা? 'নিজস্ব' বলিয়া যে ঘরখানিতে শুইতে পাইয়াছে সে ঘরকে 'নিজস্ব' বলার মত ধাষ্টমো আর কী আছে? গুদামঘর বলিলেই কি ঠিক বলা হয় না তাহাকে? ত্রিপুরাসুন্দরীর ভাগে দোতলায় মাত্র এই একখানিই ঘর, দোতলা বলিয়াই কিছুটা শুকনা খরা গোছের, নীচের তলার মত অত নোনাধরা নয়। কাজে কাজেই সারা বছরের মুগকলাই ছোলা মটর বস্তাবন্দী করিয়া কোথায় রাখা যাইবে এমন নিরাপদে? সারাবছরের আলুগুলাও রাখিতে হয় অনুপমার চৌকির তলায়। এ ছাড়া তাকের উপর বড়ির টিন আর আচারের বোতল-গুলাও না রাখিলে চলে না। আর বাক্স প্যাটরা আলনা দেরাজ ভারী ভারী যা দুই-একটা আছে ত্রিপুরসুন্দরীর, সেও তো দোতলায় রাখিবার জিনিস।

এ যাবৎ নিজেই শুইয়া অনিয়াছেন ত্রিপুরাসুন্দরী, ছেলের বিবাহের পর হইতে অধিকারটা ছাড়িয়াছেন।

পাঠ্যপুস্তকের বোঝা নামাইয়া ছুটিতে যখন বাড়ি আসে হীরালাল, তখন স্ফূর্তির আতিশয্যে তুচ্ছ অসুবিধা তাহার চোখেও ঠেকে না। আর অসুবিধাই বা কী, বিছানা পাতিবার মত হাত কয়েক জায়গা থাকিলেই

তো যথেষ্ট। বিছানার পাশে মুগকলাইয়ের বস্তা থাকিলে যে কাহারও শয্যাকণ্টক রোগ হয় অথবা দীর্ঘ বিরহান্তের পর প্রবাসী প্রিয়তমের সোহাগ-সম্ভাষণ নিমপাতার মত লাগে, এ কথা বোঝা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

ছবির কথা শুনিয়া হাসি পাইল বটে, তবে তাহার হাসির খবরে যে অনুপমার কান্না পাইবে সে কথা বেচারা ভুলিয়াও সন্দেহ করে নাই। কান্না থামাইতে এবং রাগ ভাঙাইতে এক ডজন ছবির প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিতে হইল হীরালালকে।

অমূল্য ছুটিটুকুকে তো বেঘোরে যাইতে দিতে পারে না সে!

আবার ছুটি আসিতে কি আর এই সামান্ত আবদারটা ভুলিয়া যাইবে না অনুপমা?

হায়! স্ত্রীকে কতটুকুই বা চিনিয়াছে হীরালাল? প্রত্যেক চিঠিতেই সে কথা একবার করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় অনুপমা। ভুলিবার আর সুযোগ দেয় কোথায়! শেষ পর্যন্ত পরের ছুটিতে 'শান্তনু-গঙ্গা' 'দুর্বাসা-শকুন্তলা' 'অশোকবনে সীতা' প্রভৃতি বিখ্যাত ছবির সঙ্গে খানকয়েক কালীঘাটের পট মিশাইয়া পুরা-পুরি একটি ডজন করিয়াই লইয়া যাইতে হয় তাহাকে। অবশ্য বাড়ি আসিয়া বলিতে হয় নিজের শখ।

তা ত্রিপুরাসুন্দরীও ছেলের শখে খুশী হন। বাছিয়া বাছিয়া খান তিনেক ছবি তিনি ঠাকুরঘরের জন্য লইয়া যান। পিসিমা খুড়িমা ছোটঠাকুরমার দলও এক-একখানি লইতে ছাড়েন না। ঠাকুর-দেবতার ছবি বলিয়াই লওয়া। হীরালাল আবার রাগ করিবে কোন্ মুখে? বরং ধন্য হইয়া যাইবার কথা তাহার।

ধন্য হইল বটে, তবে সেবারের চার-চারটা দিন ছুটি তাহার মাঠে মারা গেল। কথাই কহিল না অনুপমা।

ছুটির পর ছুটি আসে, ভালয় মন্দয় কাটিয়া যায়। অবশেষে পড়ার পালা সাঙ্গ হয়। বি. এ. পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারের পোস্টটা পাইয়া যায় হীরালাল।

ত্রিপুরাসুন্দরী সত্যনারায়ণের সিন্নি দেন, কলিকাতায় কালীঘাটে পূজা পাঠান, বেশ একটু উৎসবের হাওয়া বয় বাড়িতে।

অনুপমা?

এই উৎসবের আনন্দের মধ্যে তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, কে যেন তাহার দীর্ঘদিনের যত্নবর্ধিত ফুলগাছের চারাটিকে উপড়াইয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

এক রকম তাই বইকি। কলিকাতায় 'বাসা' করিবার যে ক্ষীণ আশাটুকু এতদিন হীরালালের কাল্পনিক চাকুরির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেটি ধূলিসাৎ হইয়াছে। নিষ্ঠুর হৃদয়হীন নির্বোধ স্বামীর উপর কতই রাগ করিয়া থাকিবে অনুপমা? কদিন কথা বন্ধ রাখিবে?

মাথা খুঁড়িয়া মরিতে ইচ্ছা কি সাধে হয়? গ্রামের স্কুলের মাস্টারির কাজে অনুপমার যে আপত্তি কিসের, সেটা ঠিক বুঝিবার মত বুদ্ধিও নাই হীরালালের। হীরালাল যদি এই গ্রামের বাড়িতে কায়েমী হইয়া বসে, জীবনে কি আর মাথা তুলতে পাইবে অনুপমা!

সিন্নির প্রসাদ পাইতে অনেক লোক আসে, সকলেই ত্রিপুরাসুন্দরীর ভাগ্যের প্রশংসা করে, দুই-একজন আবার বউয়ের 'পয়' সম্বন্ধেও আস্থা দেখায়। বংশের মধ্যে হীরালালই বি. এ. পাস করিয়াছে, এটা তো আর কম গৌরবের কথা নয়। তাহার উপর আবার পাস করিতে-না-করিতেই চাকুরি—হাই স্কুলের হেডমাস্টার, গ্রামের মধ্যে রীতিমত বিশিষ্ট পদ।

বেশী রাত্রে ঘরে আসে অনুপমা।

হীরালাল বলে, সকলেই আমার ভাগ্যের প্রশংসা করছে, শুধু তোমার মুখে হাসি নেই কেন বল তো?

অনুপমা মৃদু হাসিয়া বলে, হিংসেয়।

দেখে শুনে তাই মনে হচ্ছে যে। সত্যি, তুমি কি খুশী হও নি? অথচ বাড়িতে—এই তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকতে পাব বলে কবে থেকে চেষ্টা করেছি এইটার জন্যে।

সকলের সঙ্গে থেকে তো চারখানা হাত গজাবে।—অনুপমা এবার বেশ জোরালো ভাষাতেই নিজের মতামত ব্যক্ত করে, এই জঙ্গলে শেকড় গজালে জীবনেও কি আর আমার সাধ মিটবে?

হীরালাল বিরক্ত হয়, বলে, তোমার সাধ তো সেই আলাদা হওয়া? নিজের বাড়ি আর একলার সংসার?

নিশ্চয়ই তো, কেন নয়? নিজের একটা আলাদা বাড়ি না থাকলে কি সুখে সংসার করা যায়? তুমি দেখো, বাড়ি আমি করবই। বাড়ি করব—ইচ্ছেমতন সাজাব গোছাব।

তাই কোরো। চাকরি কোরো একটা, মন্দ হবে না। এখন সর, শুই।

ইস্‌ এখুনি যেন ঘুম পেল?

অনুপমা হাসে।

পাবে না কি। বসে বসে তোমার কূটকচালে কথা শুনব! কী যে এক গোঁ নিয়ে ঢুকেছিলে এ বাড়িতে!

রাগ করিয়া পাশ ফিরিয়া শোয় হীরালাল, আর মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়ে। সারাদিন বিস্তর খাটুনি গিয়াছে।

বিস্তর খাটুনি সারাদিন অনুপমারও না গিয়াছে তা নয়, কিন্তু ঘুম আসে কই? রাগে দুঃখে আশাভঙ্গের তীব্র ক্ষোভে যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করিতে থাকে।

কিন্তু না—না। আশা সে ছাড়িবে না, কিছুতেই না।

ছবির মত নিজস্ব বাড়ি একখানি সে করিয়া তুলিবেই যেমন করিয়া হোক। দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙাইবে ভাল ভাল ছবি, জানালা-দরজায় রঙিন পর্দা, ভাঁড়ার ঘরে একগাদা মাটির হাঁড়ি-কলসীর বদলে সভ্যভব্য টিন আর কাচের বোতল। ভারী ভারী কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি বাতিল করিয়া দিয়া কার্পেটের আসন বুনিবে হীরালালের জন্য, খাগড়াই ফুল-কাঁসার বাসন কিনিবে এক সেট, কাঠের উনানের পাট তুলিয়া কয়লার উনান পাতিবে সহরের মত, অনুপমার বাড়িতে পানের বাটায় চুন-খয়েরের ছোপ পড়িবে না, বিছানায় তেলের দাগ নয়, আলনার কাপড়গুলি পরিপাটি, বাসন-গুলি সর্বদা মাজা-ঘষা—দেখিবার মত আর দেখাইবার মত সংসার।

আর, অনুপমার ভিতরে যে অনাগত শিশুর অস্পষ্ট পদধ্বনি শোনা যাইতেছে তাহার জন্য আনিবে অজস্র উপকরণ—বেতের দোলা, দুধের বোতল, রুপোর বাটি, আরও কত কী! এ বাড়ির ছোট ছেলেরা যা চক্ষেও দেখে নাই কোনদিন।

হীরালাল অঘোরে ঘুমায়, আর অনুপমা অগাধ স্বপ্ন দেখে।

সেই বাড়ির কোথায় কী রাখা হইবে, কোন্‌খানে বসিয়া কী কাজ করিবে অনুপমা, সে সব অনুপমার মুখস্থ।

৩

আষাঢ়ের মাঝামাঝি প্রথম সন্তান হইল অনুপমার। কল্পনার খোকা নয়—

মেয়ে। ভরা বর্ষা—কচি মেয়ে লইয়া কষ্টের একশেষ হইল সেবার। প্রথম সন্তানের দায়িত্ব সংসারের উপরওয়ালাদের ভাগ করিয়া লইবার কথা, কিন্তু অনুপমার যে 'বুড়ো বয়সে'র মেয়ে। তিন ছেলের মা হইবার বয়সে একটা—তাও আবার ছেলে নয়, মাটির ঢিবি। কাহার দায় পড়িয়াছে যে তাহার দায়িত্ব লইতে যাইবে? বরং মেয়ের আদিখ্যেতায় সে সংসারের কাজে ঢিলা দেয়, এইতেই অসন্তোষের আর অন্ত থাকে না লোকের।

অনুপমার ছোট জা, অনুপমার বিবাহের দুই বৎসর পরে বিবাহ হইল যাহার, সেও দুইটি খোকা সামলাইয়া সংসারের কত বায়নাক্কা সামলায়। ছেলেদের লইয়া আদিখ্যেতা তো দূরের কথা, দৃক্‌পাত মাত্র করে না তাহাদের পানে।

ছোট জায়ের ছেলেদের দিকে চাহিয়া নিজের মেয়ের জন্য আর বেতের দোলার বায়না করিতে পারে না অনুপমা। জামা কাঁথা ঝিনুক বাটিরই বা এত কি দরকার, যে ছেলেটি ঝিনুক-বাটির গণ্ডি কাটাইয়াছে তাহার পরিত্যক্তগুলাতেই যখন কাজ চলিয়া যায়?

ভাগ্যক্রমে অনুপমার মেয়ে কাঁদুনে।

ত্রিপুরাসুন্দরী যখন-তখন মুখ ঝামটা দেন: বাবা! বাবা! মেয়ে নয় তো যেন ভাঙা কাঁসর! বাজ্‌ছি বেজেই আছে। হবে না কেন, মা যেমন বাচাল তেমনই হবে তো মেয়ে। মহেশ্বরীও আজকাল যেন বিরূপ, বরং ঢল নামিয়াছে লতিকার দিকে। তাই তিনিও মেয়ে কাঁদিলেই বেজার মুখে বলেন, তোমার সানাই-বাঁশি থামাও নাতবউ, দোহাই। বাপ রে বাপ, এই তো আরও কচি ছেলে রয়েছে বাড়িতে—টুঁ শব্দ আছে?

সুবিধা পাইলে হীরালালকে অনুযোগ করে অনুপমা: কেউ তো দেখতে পারে না মেয়েটাকে, তুমিই নাও না। কোলে কর না একটু।

হীরালাল লাফাইয়া ওঠে: রক্ষে কর। আমি ওসব ছেলেপুলে নিতে পারি না। তা ছাড়া কে কোথায় দেখে ফেলবে!

একালের ছেলেরা এমন কথা শুনিয়া হাসিয়া ডিগবাজি খাইবে, কিন্তু হীরালালের আমলে বাপের পক্ষে ছেলেমেয়েকে কোলে-পিঠে লওয়া নিতান্তই লজ্জাকর ব্যাপার ছিল।

মেয়েকে ফেলিয়া রাখিয়া রান্নাঘরে চলিয়া যাইত অনুপমা, আর কল্পনা করিত তাহার নিজের রান্নাঘরের, যাহার এক পাশে পাতা আছে ছোট্ট একটি

নিচু চৌকি—বর্ষার দিনে আর শীতের রাত্রে যাহার উপর ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া এপাশে বসিয়া ছোট ছোট হাঁড়িকড়ায় রান্না করিবে অনুপমা। উনানের আগুনের তাতে গরম থাকিবে ঘর।

অনুপমার মেয়েকে একদিন দেখিতে আসিল সুধা।

শুধু হাতে আসে নাই। দুইখানা কাঁথা আর একটা ঝিনুক-বাটি আনিয়াছে। দুরন্ত দামাল ছেলে কোলে। মোটাসোটা ফরসা ধবধবে ছেলেটি। সুধার সাজপোশাকও চমৎকার। সুধার ছেলের কাছে—কালো রোগা লতিকার ছেলের একটা পচা পুরানো জামা পরা অনুপমার মেয়েটাকে এত শ্রীহীন দেখায়, নিজেরই ঘৃণা হয় অনুপমার। রাগও আসে সুধার উপর। মেয়ে দেখা তো শুধু ছুতা, নিজেকে দেখাইতে আসা মাত্র। ওর 'কুমড়ো পটাশ' ছেলে কেমন চলে, কেমন বলে, কেমন হাসে, শুনিবার জন্য ঘুম ধরিতেছে না মানুষের!

তা শুধু ছেলের কথা নয়, নিজের কথাও বিস্তর কয় সুধা। বাড়িতে সে আরও দুইখানা ঘর তুলিয়াছে। শ্রীক্ষেত্র গিয়া রাশিকৃত বাসন কিনিয়া আনিয়াছে, কলিকাতায় বাপের বাড়ি গিয়া স্বদেশী মেলা হইতে চিনেমাটির লক্ষ্মী-সরস্বতী পুতুল সওদা করিয়া আনিয়াছে আড়াই টাকা জোড়া দিয়া। বিশেষ করিয়া ছেলের দুধ-খাইবার জন্য একটা কালো গরু কিনিবে এবার—এ সমস্ত কথাই জানাইয়া যায় সুধা। শেষে আরও বলে, বলা উচিত নয়, গুরু-জন, বুড়ী মরেছে—না, হাড়ে বাতাস লেগেছে। বাবাঃ! এ বাবা দিব্যি আছি। কিছু মনে কোর না ভাই, তোমার মতন এই "বিরিঞ্চির গুষ্টি"তে পড়লে আমি তো ভাই পাগল হয়ে যেতাম।

অপ্রতিভ অনুপমা ঠিকমত উত্তর দিতে পারে না। মনে মনে বলে, পাগল হওয়া অত সোজা নয়।

৪

দিনের পর দিন কাটে, মেয়ের কোলে পর পর দুইটি ছেলে হয় অনুপমার। আরও দুইজন দেওরের বিবাহ হইয়াছে, তাহাদেরও একটি দুইটি ছেলে মেয়ে হইতে শুরু করিয়াছে। ননদরা আসে—কেউ শরীর সারাইতে, কেউ বা আঁতুড় তোলাইতে। 'গোলে হরিবোল' কোথা দিয়া যেন, মানুষ হইতে থাকে অনুপমার ছেলেরা। অনুপমা বড়বউ, তাহার দায়িত্ব বেশী। তা ছাড়া,

দেওরদের কলিকাতায় অফিসের চাকুরি, ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে, তাদের বউ-ছেলের মতন যত্ন-আদরে বাড়িতে থাকা মাস্টারের বউয়ের হওয়া সম্ভব নয়।

ছেলেদের বেতের দোলা, ঠেলাগাড়ি, আর রঙিন নেটের মশারির কথা নিজেরও আর মনে পড়ে না অনুপমার। 'শান্তনু ও গঙ্গা'র ছবির শোকে একদিন কাঁদিয়া বালিশ ভিজাইয়াছিল, এ কথা ভাবিলে হাসি পায় এখন। স্থূল বস্তুর অভাবটাই যে সত্যকার অভাব—এ কথা অনুপমা বুঝিতে শিখিয়াছে আজকাল।

শোবার ঘরের খাটের তলায় তাই স্তূপীকৃত হইতেছে ঘরকন্নার অজস্র উপকরণ—বঁটি কাটারি কুলো ডালার মত স্থূল উপকরণ। অবশ্য দোতলার সেই ঘরখানায় নয়। সে ঘরে আজকাল ছোট জা শোয়। একেই সে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, তা ছাড়া বারো মাস সর্দি-কাশির ধাত, কাজেই দোতলার ঘরটা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া মহেশ্বরীর ঘরে আশ্রয় লইতে হইয়াছে অনুপমাকে। খালিই পড়িয়াছিল ঘরটা, গেল আশ্বিনে প্রচণ্ড সেই ঝড়ের রাত্রে মারা গেলেন মহেশ্বরী। মারা গেলেন অবশ্য ঝড়ে নয়—রোগেই, তবে মার্কামারা দিনটি।

পাঁচটি ছেলেমেয়ে লইয়া এ ঘরে কুলানো সম্ভব নয়, বড় মেয়েটি ঠাকুরমার ঘরে আর হীরালাল বৈঠকখানায় শোয় তাই রক্ষা। একেই ছোট ঘর, তার উপর আবার আধখানা ঘর জুড়িয়া বর্ষার দিনের প্রয়োজনে শুকনো কাঠ জমা করা আছে। মহেশ্বরী আবার শুধু কাঠ রাখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না—বাড়িসুদ্ধ সকলের টিটকারি সহিয়াও রাজ্যের নারকেলের মালা, ডাবের ছোবড়া, আখের ছিলতে আর সজিনা ডাটার খোসা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। মহেশ্বরীর মৃত্যুর পর এই তুচ্ছ জিনিসগুলা টানিয়া ফেলিয়া দিতে কেমন যেন মায়া হয় অনুপমার। সবই আছে। মাঝখানে একটা বড় চৌকি পাতিয়া আড়াআড়ি করিয়া শোয় পাঁচজনে। পা ছড়ানো যায় না, সারারাত পা গুটাইয়া শুইতে হয় অনুপমাকে।

ইহারই ভিতর আবার একদিন আধদিন হীরালাল আসিয়া জোটে। ছোট ছেলেটাকে দিয়া চুপি চুপি ডাকয়া পাঠায় অনুপমা। কুণ্ঠিত হীরালাল আসিয়া এদিক ওদিক তাকায়, বলে, বউমারা কোথায় সব?

'বউমারা' অর্থে ভাদ্রবধূরা

অনুপমা ঝঙ্কার দিয়া ওঠে : যেখানে থাকবার সেখানেই আছে। কেন, তারা তোমায় ফাঁসি দেবে নাকি ?

না না—ইয়ে—তাই বলছি। কী দরকার পড়ল, ডেকে পাঠালে যে ?

কেন দরকার না পড়লে ডেকে পাঠাতে নেই ? পরপুরুষ নাকি ?

আঃ, কী যে বল! জিভের আঁট আর কখনও হল না তোমার। গোড়া থেকে সেই 'ভেন্ন' হওয়া নিয়ে শুরু, মনে আছে তো ?—হীরালাল হাসে।

মনে! অনুপমার আবার মনে নাই সে কথা! জীবনভোর সেই কথাই তো মনে রাখিয়া আসিতেছে সে। কিন্তু হঠাৎ হীরালাল সেই প্রথম রাতের কথা তুলিতেই কেমন নেশা লাগে অনুপমার, বড় মেয়েটার বয়সের কথা তুলিয়া যে পাত্র খুঁজিবার তাগিদ দিতে ডাকিয়া আনিয়াছে হীরালালকে সে কথা যেন মনেই থাকে না। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে, হ্যাঁ, সেই অবধি 'ভেন্ন' হচ্ছি, অবশেষে এই তোমার সঙ্গে 'ভেন্ন'।

লেপের মধ্যে পা ঢুকাইয়া দিয়া জুত করিয়া বসে হীরালাল, বলে, সত্যি তাই দেখছি। দু-একখানা ঘর না তুললে আর—

অনুপমা একটু রহস্যময় হাসি হাসিয়া ওঠে : ঘর তুলতে হলে আর এ ভিটেয় নয়—নিজের জমিতে।

নিজের জমি ?—হীরালাল পরিহাস মনে করিয়া হাসিতে থাকে : তা হলে আমার এই টাকের ওপর ঘর তুলতে হয়। নিজের বলতে তো এই-টুকুই জমি দেখছি।

ঠাট্টা ভাবছ—চাপা আর উত্তেজিত শোনায় অনুপমার কণ্ঠস্বর : জমি আমি কিনেছি, তা জান ?

তার মানে ?

মানে আবার কী ? কিনে ফেললাম পাঁচ কাঠা জমি। চৌধুরী-গিন্নীর অবস্থা তো জানই ? মেয়ের বিয়ের ছুতোয় বলতে গেলে ভিক্ষে চাইতে এসেছিল—আমি কৌশল করলাম, বললাম, খানিকটা জমি বরং আমায় দাও চৌধুরীখুড়ী, আমি এক শো টাকা দিচ্ছি।

বল কী ? এক শো টাকা তুমি পেলে কোথায় ?

সে আমার ছিল।

হীরালাল মাথা নাড়া দেয় : অমনি 'ছিল'! পাবে কোথায় ? গয়না বাঁধা দিয়েছ নিশ্চয় ?

বাঁধা নয়, ওই চৌধুরীগিন্নীকে বেচলাম। চার ভরির তোলা হারছড়াটা ছিল যে।

হারটা ঘোচালে?—হীরালাল বিরক্তি প্রকাশ করে।

হার! হার নিয়ে আমি কি ধুয়ে জল খাব? গিন্নীবান্নী মানুষের তোলা হারের তো ভারি দরকার।

সোনার আবার দরকার নেই!—হীরালাল 'গিন্নীবান্নী' স্ত্রীর এমন নির্লোভ উদারতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। অপ্রসন্নভাবেই বলে, না না, ভারি অন্যায় করেছ। মেয়েটার বিয়ের সময় কাজে লাগতে পারত।

অনুপমা জ্বলিয়া ওঠে: কেন, মেয়ের বিয়ের সুবিধে আমি করতে যাব কেন? যে যার নিজের তালে আছে। তোমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা তুমি ভাবো গে যাও। আমার বাড়ির কথা তুমি একদিনের তরে ভেবেছ? না খেয়ে না পরে গয়না বেচে যেমন করে হোক বাড়ি আমি করবই, তুমি দেখো।

সকালবেলা ছোট জা বীণা হাসিয়া হাসিয়া বলে, বট্‌ঠাকুর বুঝি আজকাল বাড়ির ভেতরেই শুচ্ছেন দিদি? অতটুকু ঘরে কুলোয়?

হাসি দেখিয়া আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠে অনুপমার, মেয়ের বিয়ের আলোচনা করিতে করিতে শীতের রাত্রে আলস্যের বশে আর বাহিরে যাইতে পারে নাই হীরালাল, ছোট জায়ের কাছে এ কৈফিয়তটা দিতে প্রবৃত্তি হয় না। তীক্ষ্নস্বরে বলিয়া ওঠে, না কুলোলেই বা উপায় কী? বারো মাস তো আর মানুষ 'থানছাড়া মানছাড়া' হয়ে থাকতে পারে না? তোমাদের মতন রসের গল্প না হোক, দুটো দরকারী কথাও কি আর নেই মানুষের?

চটছেন কেন? তাই জিজ্ঞেস করছি, একটা তো মোট চৌকি—পুরুষ মানুষ, পারেনও তো এত কষ্ট করতে!

বীণা নিজের কাজে চলিয়া যায়। তাকাইয়া তাকাইয়া মনে হয় অনুপমার, বীণা যেন তাকে ভয়ঙ্কর একটা অপমান করিয়া গেল।

পাঁচ কাঠা জমির মধ্যে কাঠা তিনেকের উপর বাড়িখানা তুলিবে সে, ভাল ঘরখানি রাখিবে হীরালালের নামে। আরাম পাইলে যে আরাম করিতেও জানে হীরালাল, তাহার প্রমাণ দেখাইয়া দিবে। বিছানা বালিশ লেপ কাঁথা সব কিছুই তো একটি একটি করিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে অনুপমা।

বাঘিনীর মত আগলাইয়া রখিয়াছে, প্রাণে ধরিয়া এতটুকু জিনিস ব্যবহার করে না। এমন কী সেবারে রাসের মেলা দেখিতে গিয়া হীরালালের জন্ম যে শৌখিন গড়গড়াটা কিনিয়া আনিয়াছিল, সেটি পর্যন্ত আনকোরা তোলা আছে। নূতন বাড়ির রোয়াকে বেতের মোড়া পাতিয়া বসিয়া হীরালাল চকচকে নলে তামাক খাইবে বলিয়া।

প্রত্যেকবার ছেলেমেয়েদের নূতন জামা জুতাগুলা তুলিয়া রাখিয়া রাখিয়া ছোট হইয়া যাইবার মুখে পরিতে দিতে হয়···আশায় আশায় আর কতদিন কাটাইবে অনুপমা ?

৫

অনেক দিনের পর সেবার সেজ ননদ বাসন্তী বাপের বাড়ি আসিল।

অবস্থা ভাল, পশ্চিমে থাকে, বড় একটা আসাযাওয়া নাই।···বলিল, মা কোন্‌দিন আছেন কোন্‌দিন নেই, এলুম একবার দেখতে।

একঘর ছেলেমেয়ে বাসন্তীর, তবু সব ফিটফাট ছিমছাম। এ অঞ্চলে এমন পোশাক পরিচ্ছদ দুর্লভ। খাওয়াদাওয়ার তরিবৎও বেশী তাহাদের। মুড়ি মুড়কি দেখিয়া নাকি হাসিয়া খুন তাহারা !

অবস্থা ভাল তাই আদরও বেশী বাসন্তীর। অথর্ব ত্রিপুরাসুন্দরী চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া তাহাদের আদর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেন, অনুষ্ঠানের ক্রটি ধরিয়া বউদের গালিগালাজ করেন। বাসন্তী আসায় সকলেই তটস্থ। বাসন্তী দুইটা কথা কহিলে সকলেই যেন ধন্য।

শুধু অনুপমারই বসিয়া গালগল্প করিবার সময় নাই। ননদ নন্দাই ভাগ্নে ভাগ্নী আসায় তাহার খাটুনি তো সহজ বাড়ে নাই ? সেই তো বড়, সব দায়িত্ব তো তাহারই।

অনুপমা খাটে বেশী তবু, 'মুখের' জন্য কেউই তাহাকে সুচক্ষে দেখে না।

বাসন্তী শুনাইয়া শুনাইয়া বলে, বাবা, বড় গিন্নীর আর দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না। একবার একটা কথা কইবারও ফুরসত নেই। বাড়িতে যে একটা মানুষ এসেছে—

অনুপমা জলের ঘড়াটা কাঁকাল হইতে নামাইয়া বলে, মানুষের সঙ্গে 'মনিষ্যত্ব' করবার জন্যে মানুষ তো বাড়িতে ঢের আছে ভাই। গাধা, গাধার কাজই করে।

ও বাবা! কী জানি ভাই, কী যে এত কাজ তোমাদের কে জানে! এই তো আমার সংসারেও তো কাজ বড় কম নয়। বামুন চাকর গুটি ছয়েক থাকলে কী হবে, তাদের চরানোও সোজা কাজ নয়। সবই তো করি, তবু বেড়াতে যাই, মানুষ এলে আড্ডা দিই, আর তোমাদের উদয়াস্ত কেবল ভাতের হাঁড়ি।

মুখ্যুর যা দশা।—বলিয়া চলিয়া যায় অনুপমা।

লতিকা ননদের গা টিপিয়া বলে, দেখলে তো? চব্বিশ ঘণ্টা আগুন। সংসারের সঙ্গে দিনরাত যেন 'ঢালে খাঁড়া'য় আছেন। মুখের সামনে এগোয় কার সাধ্যি!

তা আর জানি নে।—বাসন্তী বলে, বিয়ের কনে এসে বলেছিল—'আলাদা হব'। ও কি সোজা মানুষ?

লতিকা অগ্রাহ্যভরে মুখ ঘুরাইয়া বলে, তা হলেই পারতেন? কে মাথার দিব্যি দিয়ে আটকেছিল?

বড়দার মুরোদটাও দেখতে হবে তো।

রান্নাঘরের ভিতর হইতে অনুপমার খুন্তির শব্দটা মাঝে মাঝে থামিয়া যায়।

বাড়তি লোক হইলে, বাসনের অকুলান পড়িলে, এ বাড়িতে—শুধু এ বাড়িতে কেন, এ অঞ্চলেই—কলাপাতা কাটিয়া ভাত খাওয়ার প্রথা। বিশেষ তো কুঁচোকাঁচার। বাসন্তীর ছেলেমেয়েরা কিন্তু পাতায় খাইতে নারাজ। বাসন্তী হাঁক দিয়া বলে, ওগো বাড়ির গিন্নীরা, তোমাদের কুটুম্বরা বলছে—'মামার বাড়িতে থালা নেই কেন, ছিঃ! নাও, এখন মান রাখ নিজেদের।

সেজবউ অপ্রতিভভাবে বলে, থালা তো বেশী নেই ঠাকুরঝি, সেবারে আবার চুরি গেল একগোছা।

কেন গো, বড়গিন্নীর ঘরে চৌকির তলায় তো ধামাভর্তি ঢের বাসন দেখলাম।

দিদির ঘরে?—সেজবউ মুখচোখের ভাবে অনেক কিছু ফুটাইয়া বলে, বেল পাকলে কাকের কী? ওসব উনি নিজের টাকা দিয়ে কিনেছেন—গেরস্থর হাত দেবার হুকুম নেই।

মরণ আর কী! বাসন নিয়ে করবেন কী, সগ্‌গে বাতি দেবেন?

না গো না, যখন ভেন্ন হবেন তখন সুখ করবেন। দেখুন গে না উঁকি

মেয়ে—বঁটি কাটারি শিল নোড়া জাঁতা কুলো থেকে শুরু করে এস্তক ডাল রাঁধবার কাঠিটি পর্যন্ত সব মজুত আছে। একটি জিনিসে হাত দিতে যান—দেখবেন।

কী দজ্জাল বউ বাবা! এমনি একালষেঁড়ে স্বার্থপর বউ থাকলে কখনও সংসারে লক্ষ্মীশ্রী হয়?

অনেক চিপটেন কাটিয়া, অনেক জ্বালাতন করিয়া সেবার বাসন্তী বিদায় লইল। পরদিনই অনুপমা গেল সুধার বাড়ি।

সুধার বর কনট্রাক্টর, অনুরোধ করিলে সুবিধা সুযোগে অল্প খরচে যেমন-তেমন বাড়ি একটা আরম্ভ করিয়া দিতে পারে সে।

অনেক দিনই 'যাই যাই' করিয়াছে অনুপমা, কিন্তু সুধার সেই অমায়িকতার আবরণ দেওয়া অহঙ্কারের কথাগুলা মনে করিলে আর যাইতে উৎসাহ হয় না।

আজ সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল।

ভগবানের কিছু দয়া আছে হয়তো, পথেই দেখা সুবোধের সঙ্গে। অনুপমা যেন বর্তাইয়া যায়। আগে অবশ্য কথা বলাবলি ছিল না, এখন আর অত মানিতে পারে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইয়া গেল জামাই হইয়াছে তাহার, দুইটি নাতি নাতনী, অর্ধেক চুলে পাক ধরিয়াছে, এখন আবার অত বউগিরি কিসের?

বলে, ভালই হল, দেখা হল, আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

কেন বলুন তো? হঠাৎ?

হঠাৎ নয়, অনেক দিন থেকেই ভাবছি—

অতঃপর অনেক ভনিতা আর অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া নিজের আবেদন জানায় অনুপমা। সুধার চোখের সামনে নয় বলিয়াই পারে। সুধার সঙ্গে সখীত্বের সম্বন্ধ ধরিয়া 'ভাই' বলিয়া কথা কয় না সুবোধের সঙ্গে, মহেশ্বরীর সম্বন্ধের সূত্র ধরিয়া বলে 'পিসেমশাই'। শেষ পর্যন্ত প্রায় হাতজোড় করে: আমার অনুরোধটি রাখতেই হবে পিসেমশাই, 'না' বললে শুনব না। আমার অনেক দিনের সাধ।

বিব্রত সুবোধ জানিতে চাহে, প্রথমে অন্তত কত টাকা ফেলিতে

পারিবে অনুপমা। জিনিসপত্রের তো আর আগের মত দর নাই? সবই চড়িয়াছে।

অনুপমা মনে মনে হিসাব করিতে থাকে। সব জিনিসের সঙ্গে সোনারও দর চড়িয়াছে...কুড়ি টাকার সোনা এখন চল্লিশ টাকা। অতএব আট ভরির সেই অনন্ত জোড়াটা বেচিয়া দিলে তিন শো সাড়ে তিন শো হয়, তা' ছাড়া— খুচরা জমাইয়া গোটা পঞ্চাশ টাকা হইয়াছে।

বলে, গোড়ায় আমি চারশো দেবো আপনার হাতে—

চার শো? বলেন কী? বনেদ খুঁড়তেই তো বেরিয়ে যাবে ও-টাকা।

কী করব পিসেমশাই, দেখছেন তো ওই মানুষ! জীবনভোর রোজগার করলেন আর পাঁচজনের সংসারে ঢাললেন, কখনও এক পয়সা রাখলেন না। সুবিধে করে আরম্ভ করে দিন, তারপর আপনার আশীর্বাদে আমার বড় ছেলের একটা চাকরির আশা হচ্ছে, ধীরে ধীরে শোধ করে দেব।

অর্থাৎ টাকাটা অনুপমা ধারই চায় সুবোধের কাছে।

অনুপমার মুখ দেখিয়া কি দয়া হয় সুবোধের? না, জবরদস্তিওয়ালা সুধাকে লইয়া ঘরকন্নার অভ্যস্ত চোখে অনুপমার এই বিনীত কুণ্ঠিত ভাবটা নূতন লাগে! যাই ভাবুক, সুবোধ রাজী হয়।

পুরনো ইঁটকাঠও তো খুঁজিলে মেলে।

মাস দুই পরে অনুপমার বাড়ির বনেদ খোঁড়া শুরু হয়।

বড়ছেলে সুরেশ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাহিনার একটা চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। অনুপমার আর ভাবনা কী?

প্রথমে ব্যাপারটা চুপিচাপি থাকিলেও প্রকাশ হইতে দেরি হয় না।

জা-দেওররা অগ্নিমূর্তি হইয়া ওঠে।

এতদিন সংসারে গিন্নীত্ব করিয়া লুকাইয়া যে অনেক টাকা করিয়াছে অনুপমা, এ সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ থাকে না। ভোলানাথ হীরালালকেও আর ছাড়িয়া কথা কহে না কেউ। তলে তলে সলাপরামর্শ না থাকিলে একলা মেয়েমানুষ আবার এতবড় কাণ্ডটা ফাঁদিয়া বসিতে পারে? এই মতলবই তবে ছিল এতোদিন? গিন্নী বসিয়া বসিয়া সংসারের গোছ করিয়াছেন আর কর্তা ওদিকে বাড়ির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এরা যাই বোকাসোকা

ভালমানুষ, তাই কোন সন্দেহ করে নাই। এখন হিসাব দিক হীরালাল, বাড়ি ফাঁদিবার টাকা তার আসে কোথা হইতে ?

হীরালাল এদিকে কথা বন্ধ করিয়াছে অনুপমার সঙ্গে।

তিরিশ বৎসর মাস্টারি করিয়া যতই গাধা বনিয়া থাক্, স্ত্রীর উপর তেজ ফলাইবার উপযুক্ত পৌরুষটুকু এখনও বজায় আছে।

কিন্তু অনুপমা আর টলে না। এতদিনে সে দাঁড়াইবার মাটি পাইয়াছে, চারখানা দেওয়াল উঠিয়াছে তাহার নিজের জমিতে। শুধু অনন্ত নয়, বারোমেসে হার আর বালা জোড়াটাও গিয়াছে। তা হোক, শাঁখা-লোহা বজায় থাক্ অনুপমার, তাই ঢের।

সুরেশের টাকা হইতে তিরিশ টাকা করিয়া ধার শোধ দেয় অনুপমা, পনেরো টাকা রাখে ছেলের ট্রেনভাড়া আর জলখাবার বাবদ। তবু যেন আর চলে না। খাওয়াপরায় টান দিয়াও চলে না। হীরালালও যেন আজকাল প্রতিপক্ষ। রাত্রে একদিন দুধ না পাইলে বলে, তা হোক তোমার বাড়ি তো হচ্ছে তা হলেই হল। বুড়ো বয়সে আফিংটা ধরে ফেলেছি তাই যা একটু—মরুক গে, অভ্যাস হয়ে যাবে।

অনুপমার রাগও হয়, দুঃখও হয়। সত্যাই বড় বুড়া হইয়া পড়িয়াছে হীরালাল, পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সেই যেন সত্তর বছরের মত দেখায় হীরালালকে। আহা,…কোনদিন আরাম আয়েস পাইল না মানুষটা। টাকা জমাইবার ঝোঁকে তেমন ভাল করিয়া একদিন খাওয়ানো মাখানোও করে নাই অনুপমা। ছোট জায়েরা সংসারে ব্যবস্থা ছাড়াও আলাদা পয়সা খরচ করিয়া কত ভালমন্দ খাওয়ায় স্বামীপুত্রকে।

দীর্ঘ চল্লিশটা বছর অনুপমা করিল কী ?

অবশেষে সত্যাই একদিন গৃহপ্রবেশের দিন দেখা হয়।

অনুপমার বাড়ি একরকম শেষ হইয়াছে।

কল্পনা অনুযায়ী না হোক, তবু তো সত্যকার একটা নিজের বাড়ি। শাক-ভাত খাইলে কেউ টিটকারি দিতে আসিবে না, ঘি-দুধ খাইলে কেউ নজর দিতে বসিবে না। গলা খুলিয়া পাঁচজনের নিন্দা করিবার স্বাধীনতাও কি কম সুখের ?

পুরুতবাড়ি লোক পাঠায় অনুপমা পাঁজি দেখাইতে।

কিন্তু—

পুরোহিত আসিবার আগেই হীরালাল আসে কাঁপিতে কাঁপিতে।

বেদম জ্বর আসিয়াছে তাহার।

মহেশ্বরীর সেই ছোট্ট ঘরটাতেই আশ্রয় লইতে হয় তাহাকে। ছেলে-মেয়েদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তবু ডাক্তার কবিরাজ আসিয়া বসিবার জায়গা পায় না। রায়েদের ভাগ্নে সেই ছোকরা ডাক্তারটি তো মুখের উপরই বলিয়া গেল, এমন করে থাকেন কী করে, আশ্চর্য!

আশ্চর্য!

আশ্চর্য বলিয়াই তো এমনভাবে থাকার বিরুদ্ধে আজন্ম যুদ্ধ করিয়া আসিল অনুপমা। এমন করিয়া থাকিবে না বলিয়াই তো আজ পর্যন্ত এমন করিয়া থাকা।

কিন্তু সে কথা কে বুঝিবে?

হীরালালই সে বুঝিল না কোনদিন। বুঝিল না বলিয়াই তো অনুপমার বাড়া ভাতে ছাই দিয়া সেই ঘুঁটের ঘরটায় মরিতে আসিল।...

খাট তক্তপোষের উপর মরিতে নাই, কিন্তু মরণ বাঁচন রুগীকে নাড়ানাড়ি করার উপায় না থাকিলে?...সময় ফুরাইলে মানুষ কি আর নিয়মের অপেক্ষা করিবে?

তাই চৌকী তক্তপোষ বাহির করিয়া ঘর ধোওয়া ছাড়াও উপায় থাকে না আর।

একে একে সমস্ত জিনিষ বাহির হইতে থাকে অনুপমার।

গরুর কাজ করিবার চাকরটা টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে সব... সেই সব বঁটি, কাটারি, কুলো, ডালার বিপুল সমারোহ। বস্তাবন্দী বিছানা, বালিশ, বাক্স, আর্শি কত কি!...লুকাইয়া পাড়ার লোককে দিয়া, হীরালালের খোসামোদ করিয়া যত কিছু সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছে অনুপমা এই দীর্ঘকাল ভোর।...সব আনিয়া আনিয়া উঠানে ফেলা হয়। হীরালালের কুড়ি বছর বয়সে আনা সেই কালীঘাটের পটের দরুণ 'কালীয় দমনের' ছবিখানা পর্যন্ত। ...এত জিনিষ এতটুকু ঘরে ধরিয়াছিল কোথায়?...

মরিচাধরা ছাতাপড়া ঘুণলাগা এই সব রকমারি জিনিষের দিকে বোকার মত চাহিয়া থাকে অনুপমা। এই জিনিষগুলাকে যে এতদিন বুক দিয়া

আগলাইয়া রাখিয়াছিল, কেহ উঁকি মারিতে আসিলে কুরুক্ষেত্র করিয়াছে, সে কথা মনেই থাকে না আর।

কার জিনিষ? কে ঘর বাঁধিবে? অনুপমা?

অদ্ভুত একটা সাজ করিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া যে চাহিয়া আছে সেই অনুপমা?

হীরালালকে বাদ দিয়া একলাই তো সে এতদিন ঘর বাঁধিবার আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। গৌণ হীরালাল এমন মুখ্য হইয়া উঠিল কখন যে—হীরালালের অভাবে সব মিথ্যা হইয়া গেল?

॥ নেশা ॥

বহুবিধ নেশার মধ্যে মানুষও যে একটা নেশার বস্তু, এ সত্যটা বোধ করি উপলব্ধি করবার অবস্থা থাকে না—অন্য সব নেশার মত—মনুষ্য-নেশাসক্তদেরও। তাই নেশার ঘোরে যা কিছু বিসদৃশ ব্যাপার তারা ঘটায়, তার মধ্যে বিসদৃশ কিছু দেখতে পায় না।

সমস্ত পৃথিবীটা যে কেবলমাত্র রাশি রাশি চোখকানে ভর্তি, আর সেগুলো অপরের সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ, এ হুঁস তো থাকে না ওই সব নেশাহত অন্ধদের।

হুঁশ থাকলে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত সব কিছু মাথায় করে অথবা তুচ্ছ করে পার্থ প্রত্যহ সন্ধ্যায় কৃষ্ণাদের পারিবারিক আসরে যোগ দিতে আসত না।

কিছুই না—শুধু একটু আড্ডা দিতে আসা!

সরল বেচারা, ভাবতেই পারে নি অতি সাধারণ এই ঘটনাটির ভেতর থেকে দোষণীয় কিছু আবিষ্কার করে বসা কারও পক্ষে সম্ভব!

কী আশ্চর্য!

সে কি কেবল কৃষ্ণার সঙ্গেই আড্ডা দিতে আসে? বরং সে সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। যত কিছু কাজ কৃষ্ণার, সবই তো জমানো থাকে এই চমৎকার সন্ধ্যাটুকুর জন্যে।

পার্থর তো তাই মনে হয়।

কৃষ্ণার মা মেয়েটিকে ফরমাশ করতে পেলে আর ছাড়েন না। সব ভাল ভদ্রমহিলার, ওই এক দোষ।

তারপর ধর—কৃষ্ণার বাবা আছেন প্রায় সব সময়। ছোটো ভাইবোনেরা আছে। সকলের ওপর আছে শান্তা।

কৃষ্ণার বিধবা ছোট পিসি শান্তা।

যক্ষির মত পাহারা দিচ্ছে সারাক্ষণ। নড়ে না চড়ে না, একটিবার ওঠে না। অবাক হয়ে যায় পার্থ, ওঁর কি কোনদিন কোনও কাজ থাকতে

পারে না এ সময়? কোন কর্তব্য নেই—এই আড্ডাটা পাহারা দেওয়া ছাড়া?

তা পাহারা নয় তো কী? বললেই যা শুনতে খারাপ। সেই যে জানলার ধারে বেতের মোড়াটির ওপর বসে আছে একতাল পশম আর লোহার দুটো কাঁটা নিয়ে, এ দৃশ্যের আর ব্যতিক্রম নেই।

অথচ এ আড্ডায় ওর আকর্ষণীয় কী আছে? ঘরে যদি দু শো রকমের আলোচনা হয়, একটি মন্তব্য করে না শান্তা। কোনদিন ওর গলার স্বর শোনে নি পার্থ।···ওর ওই নেহাত মেয়েলী সরু সরু আঙুল কটি যদি অমন মৃদু অথচ দ্রুত ভঙ্গীতে ওঠাপড়া না করত—অনায়াসে স্ট্যাচু বলে চালানো যেত।···সেল্‌ফের ওপর সাজানো পাথরের বুদ্ধমূর্তিটার মতই প্রায় অনড় গম্ভীর ভারিক্কী।···

শুধু নিতান্ত যখন পার্থর চড়া গলার দরাজ হাসিতে ঘর ভরে যায়, তখন পশমের ঘর থেকে একটিবারের জন্যে চোখ তুলে তাকায়। না, হঠাৎ চমকে উঠে তাকিয়ে ফেলে না, "যুগাবতারে"র ভঙ্গীতে উর্ধ্বমুখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ।···যেন বুঝতে পারছে না—পৃথিবীতে এত হাসি কেন, এত কথা কেন! যেন এতক্ষণ এ ঘরে অনুপস্থিত ছিল শান্তা, এইমাত্র এসে দাঁড়াল···চিনতে দেরি লাগছে সবাইকে।

আবার চোখ নামিয়ে নেয় দ্রুত আর নির্ভুল চলতে থাকে আঙুল। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—এই একইভাবে চালাচ্ছে শান্তা।

আশ্চর্য অধ্যবসায়!

অনেকদিন ভেবেছে পার্থ, শান্তার এই 'পোজ'এর একটা ফোটো তুলে পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপনের মত ছাপিয়ে দিলে হয় কাগজে। শান্তার মত কমবয়সী বিধবাদের কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

সামান্য দুটো লোহার কাঁটা পশমের গোলা যে বৈধব্য-যন্ত্রণার অমোঘ ঔষধ এটা কি জানে সবাই? এই নিয়েই তো স্বামীর স্মৃতি ভুলে আছে শান্তা।

"—আহা, আরও একটু বিস্মৃতি যদি আসত," পার্থ ভাবে মাঝে মাঝে—"শুধু স্বামীর স্মৃতি নয়, পার্থ আর কৃষ্ণাকেও যদি ভুলে থাকতে পারত শান্তা!"···ছাদে, বারান্দায়, সিঁড়িতে, বাড়ির আরও অন্য ঘরে বসলেই

হয় কোথাও, একদিনে 'গোলা' পরিণত হোক 'গুলি'তে, কেউ তো কিছু জ্বালাতন করতে যাবে না শাস্তাকে। তবে?

তবে কেন ভাবশূন্য মুখখানি নিয়ে এই ঘরেই সারাক্ষণ সে বসে থাকবে জানলার গোড়ায় বেতের মোড়াটি টেনে নিয়ে! বসে থাকবে যতক্ষণ থাকবে পার্থ।

পাহারা দেওয়া ভিন্ন আর কী অর্থ করা যায় এর?

পার্থর অভিমত শুনে কৃষ্ণা অবিশ্যি হাসে।

মানে প্রতিদিন যখন 'দৈবাৎ' দেখা হয়ে যায় ওদের নীচের তলায়, পার্থ চলে যাবার সময় রাস্তার দরজাটা বন্ধ করতেও তো আসার দরকার! কে আর দোতলা একতলা করতে রাজী হবে--কৃষ্ণার মত কাজের মেয়ে ছাড়া?

কৃষ্ণা হাসে, বলে, না গো না, ও ঘরের 'বাল্‌ব্'টাই যে সব চাইতে পাওয়ারফুল। পিসেমশাই মারা যাবার পর থেকে ছোট পিসীর চোখটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে কিনা। আহা বেচারা! আমার চাইতে কতই বা বড়? অথচ সব শেষ হয়ে গেছে। মায়া হয় না তোমার?

হত—পার্থ বলে—খুবই হত, যদি উনি তোমার চাইতে নিজেকে অনেক বেশী বিচক্ষণ না ভাবতেন।

তা এসব কথা কিছু আর শাস্তার কানে যায় না। আর দোতলার ঘরে শাস্তার চোখের সামনে, শাস্তার চোখ এড়িয়ে কি এমন প্রেমালাপ তারা করতে পারছে যে, হঠাৎ একদিন সন্দেহ করে বসা হল তাদের?

পার্থ আর কী করে জানবে? কৃষ্ণাই বলল। ওই সেদিনও যখন দৈবাৎ দেখা হয়ে গেল নীচের তলায়। বলল, তুমি আর কাল থেকে এসো না, খবরদার!

ঠাট্টা মনে করে হাসল পার্থ: তা হলে তো আজ আর যাওয়া হয় না। থেকেই যেতে হয়।

বাজে বোকো না—আস্তে কথা বলবার জন্যেই বোধ হয় পার্থর অত কাছে সরে আসে কৃষ্ণা: তোমার রোজ রোজ হাজরে দেওয়া নিয়ে অনেক কথা উঠেছে বাড়িতে।

পার্থ একটু গম্ভীর হল: কেন? কে কী বলেছে শুনি?

কে কখন প্রথম কী বলল জানি না, এখন তো দেখছি সবাই বলছে। আমার গতিবিধির ওপর কড়া পাহারা বসাবার পরামর্শ চলছে। শুনছি, তাতেও যদি কাজ না হয়—স্পষ্ট নিষেধ করা হবে তোমাকে। অতএব সসম্মানে নিজের পথ দেখ।

না এলে তোমার কিছু মন-কেমন করবে না তো?

নেহাত ছেলেমানুষী সুর বাজল পার্থর কণ্ঠে।

আমার? আমার কী জন্যে মন-কেমন করবে? করলে তো গার্জেনদের সন্দেহকেই সত্য করে তোলা হয়। হয় না?

কৃষ্ণার মুখ নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল চুল, দুলে উঠল কর্ণাভরণ। পার্থর মনটা কি কোন সূত্রে বাঁধা ছিল ওদের সঙ্গে? তা নয়তো অমন করে দুলে উঠছে কেন?

পারব না কৃষ্ণা।

কী পারবে না?

না-এসে থাকতে।—ভারী হয়ে এসেছে স্বর।

তোমায় কেউ কিছু বলবে, সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না যে।

গুম হয়ে গেল পার্থ।

'কেউ কিছু বললে' অবশ্য তারও সইবে না। পুরুষের কাছে প্রেমের চাইতে আত্মসম্মান অনেক বড়।

রাগ করলে?

আরও কাছে সরে এসেছে বুঝি কৃষ্ণা? নইলে অত মৃদু স্বর পার্থর কানে পৌঁছল কী করে?

তোমার ওপর? রাগ করেছি তোমার ওপর?

আমিই তো বারণ করছি।

আস্ত পাগল তুমি একটি। কিন্তু এখন? কেন এলে এখানে? কেউ কিছু বলবে না তোমাকে?

হয়তো বলবে।

তবে যাও। লক্ষ্মীটি কৃষ্ণা, পালাও। বেশ, কথা রইল আর আসব না।

ওই তো—তুমি রাগ করলে?

বাক্‌চাতুরী ফুরিয়ে আসছে কৃষ্ণার, জল এসে পড়েছে চোখে।

এই দেখ কাণ্ড। সাধে বলছি, আস্ত পাগল! সত্যিই যদি কোন

কথা ওঠে! কিন্তু আশ্চর্য! কে কী বুঝল? কটা কথাই বা আমাদের কইতে দেখেছে লোকে?

আমিও তো তাই ভাবছি—

ভারী অসহায় লাগছে কৃষ্ণাকে।

নিশ্চয় তোমার ওই ছোট পিসীর কারসাজি।

খুব মিথ্যে নয়—কৃষ্ণা উত্তর দেয়, তুমি রাগ করবে বলে বলছিলাম না। ছোট পিসীই বাধিয়েছেন কাণ্ডটি। তুমি যে বল 'পাহারা দেওয়া' সেটা দেখছি সত্যি। কে জানে বল, আমাদের চালচলন মুখচোখ সব-কিছু ওয়াচ করেন উনি! হেঁট মুখে তো পশমই বোনেন বসে বসে। অথচ উনিই অনেক কিছু বলেছেন মাকে আমাদের সম্বন্ধে।

আমি বরাবরই বুঝতে পারি। কী রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে যে তাকান মাঝে মাঝে।...কিন্তু...পালাও কৃষ্ণা, এভাবে দুজনকে দেখলে—। চললাম।

চলে গেলেও ফিরে না তাকিয়ে কে কবে যেতে পেরেছে?

কোনদিনই আর আসবে না?

এখন বলতে পারছি না।

বলে যাও—কী করে কাটাব সন্ধ্যাটা? কিসের প্রত্যাশায় কাটাব সারাটা দিন?

সে প্রশ্ন তো আমারও কৃষ্ণা? কিসের প্রত্যাশায় কাটাব সারাটা দিন!...কী জানি হয়তো পারব না, হয়তো—

না না, তা কোর না। পারব, ঠিক থাকতে পারব আমি।...আচ্ছা, যাচ্ছি। এখুনি হয়তো কেউ দেখবে কথা কইছি তোমার সঙ্গে। পৃথিবীটা কী খারাপ জায়গা!

সত্যি কৃষ্ণা, ভারি খারাপ।

পৃথিবী জায়গাটা যে কত খারাপ, সে বোধ ছিল না বলেই বোধ করি অত নিশ্চিন্ত চিত্তে কাটাচ্ছিল বেচারারা। কাটাচ্ছিল—প্রত্যাশিত দিন, ব্যাকুল সন্ধ্যা, আর স্মৃতিসুরভিত রাত্রির নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে।

কী করে আশঙ্কা করবে 'পাথরের বুদ্ধমূর্তি'রও চোখ-কান সজাগ হয়ে উঠবে! মুখর হয়ে উঠবে রসনা!

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের তীব্রতা পার্থকে আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় বিধুর করে না তুলেও ক্রুদ্ধ করে তুলেছে। ফেরার সময় পথে চলতে চলতে

শাস্তার ওপর অপরিসীম রাগ ছাড়া আর কোন ভাবই ঠাঁই পাচ্ছিল না তার মনে।

আঃ, একবার যদি ভদ্রমহিলাকে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেবার সুযোগ হত! বিধবা হলেই যে কী সাংঘাতিক হিংসুটে হয়ে যায় মেয়েরা!

রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কৃষ্ণা ভাবছিল অন্য কথা। ভাবছিল, আরও একটু সাবধান হয়ে চলাই উচিত ছিল বোধ হয়। শুধু দরজাটা বন্ধ করতে আসার পক্ষে সময়টা একটু বেশীই নেওয়া হয়ে যাচ্ছিল যেন। মাকে অতটা অবোধ আর বাবাকে অত বেশী বেহুঁশ না ভাবলেই ভাল হত।

আর ছোট পিসী! বাস্তবিকই অবোধ্য।

পাথরের পুতুলেরও বোধশক্তি থাকে?

পৃথিবীর মাটি ছাড়িয়ে অত উর্দ্ধলোক থেকেও পৃথিবীর ধুলোর স্পর্শ লাগে?

কৃষ্ণার মা ভাবছিলেন, আজকালকার মেয়েদের খুরে নমস্কার। দেখে মনে হয় কী ছেলেমানুষ! ভেতরে ভেতরে পাকামিটা দেখ! ছেলেটাই বা কী শয়তান গো! কেমন সাদাসিধে ভাবে এসে 'মাসীমা মাসীমা' বলে গল্প করে, কে বুঝবে তলে তলে আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে শুরু করেছেন! তবু তো আমি পারতপক্ষে এ সময়টা কৃষ্ণাকে এ-দিকে আসতে দিই নে। নিজেও ঘাঁটি আগলে থাকি যতটা সম্ভব। ন্যাকা বোকা মায়েদের মত এলিয়ে দিলে যে কী হত!

কী যে হতে পারত, সে কথা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠে ননদিনীকে ধন্যবাদ দেন ভদ্রমহিলা। ভাগ্যিস সময় থাকতে সাবধান করে দিল শাস্তা!

কৃষ্ণার বাবা ভাবেন, মেয়েমানুষের মনগুলো কী বিশ্রী প্যাঁচালো! কৃষ্ণা নাকি একটা মানুষ! ওই তো ঘুরে বেড়াচ্ছে—মঞ্জু অঞ্জুর চাইতে কি এত বড় লাগছে? ওকে নিয়ে এত সব বাজে বাজে আলোচনা!

বালিকা মঞ্জু শিশু অঞ্জুকে চুপি চুপি বলে, এই, দিদিকে জ্বালাতন করিস নি, দিদির মন খারাপ। দেখছিস না পার্থদা আসেন নি।

শুধু পাথরের পুতুলের মনের ভাব বোঝা যায় না।

কাটল কয়েকটা দিন।

পার্থর অনুপস্থিতিতে আড্ডাটা তেমন জমে না। কৃষ্ণার বাবা কয়েকটা সিগারেট ধ্বংস করে এক সময় উঠে পড়ে বলেন, বাজার দোকানের কিছু চাই নাকি তোমাদের? বেরুচ্ছি একটু, চাই তো বল এই বেলা।

কৃষ্ণার মা ঘাঁটি আগলানোর কাজ থেকে ছুটি পেয়ে নিশ্চিন্ত-চিত্তে রান্নাঘরে গিয়ে বামুন ঠাকুরের 'হাড়মাস ভাজা-ভাজা' করতে থাকেন। কৃষ্ণা হঠাৎ আবিষ্কার করেছে, সন্ধ্যাবেলা ছাদের খোলা হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মঞ্জু অঞ্জু খেলতে খেলতে মাঝে মাঝে এক সময় বলে ওঠে, কী, ভাল লাগছে না?

ওরই মধ্যে একদিন—হাতের বোনাটা আর কাঁটা দুটো ফেলে রেখে আড়ষ্ট আঙুলগুলো মটকাতে মটকাতে শান্তা মুখ তুলে চাইল। না, কারুর দিকে নয়, পাওয়ারফুল বাল্‌ব্‌টার দিকে। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে স্বগতোক্তি করল, আলোটা কি বদলানো হয়েছে?

কৃষ্ণা তখন ছাদ থেকে নেমে এসেছে, উক্তিটাকে একটা প্রশ্ন ভেবে উত্তর দেয়, আলোটা? কই না তো।

কী জানি, চোখটা আরও বেশী খারাপ হচ্ছে বোধ হয়।

হওয়ার অপরাধ নেই বাপু—কৃষ্ণা বলে—সারাক্ষণ ওই চোখের কাজ!

চোখের কাজ!—শান্তার যেন বুঝতে দেরি হচ্ছে কথাটা: চোখের কাজ! তুলে নিল কাঁটা দুটো।

আরও কয়েকটা দিন পরে—

বামুন ঠাকুরের মুণ্ডপাতপর্ব শেষ করে কৃষ্ণার মা এসে বসেছেন ঘরে, কর্তা বেড়িয়ে ফেরেন নি, শান্তা বসে আছে চুপচাপ জানলার দিকে মুখ করে, পঁচাত্তর বাতির আলোটা জলে যাচ্ছে আপন মনে।

শান্তার বুঝি আজ পশম ফুরিয়েছে?

হাতের পানটা মুখে ফেলে ধীরে সুস্থে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণার মা।

পশম? ও, না। চোখটা কেমন যেন—মানে চশমার পাওয়ারটা না বদলালে, কাজকর্ম সবই বন্ধ করতে হবে মনে হচ্ছে।

ও মা, সে কী? তবে তোর দাদাকে বলছিস না কেন কিছু?

নিজের জন্যে কাউকে কিছু বলতে চাই না আমি।

কৃষ্ণার মা অপ্রতিভ হয়ে যান, যেন শান্তার চোখটা যে বেশী খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সে ত্রুটি তাঁর। অল্পবয়সী বিধবা ননদিনীটিকে নিয়ে অস্বস্তি অনেক। তাও যদি বা সাধারণ ধরনের হত!

মেয়ে তো নয়, যেন একটা অপার্থিব বস্তু।

আচ্ছা, আমিই বলব ওঁকে। ভুলে মরি এই মুশকিল।...কৃষ্ণা কোথায়?

ছাদে। ছাদেই তো থাকে এ সময়।

ওই এক মেয়ে, ধিঙ্গি অবতার! রাত দুপুর অবধি ছাদে কী হচ্ছে?—সরোষ মন্তব্য করেন কৃষ্ণার মা।

মনটা বোধ হয় খারাপ থাকে—উদাসীন ভঙ্গীতে বলে শান্তা, পার্থ-টার্থ আসত সন্ধ্যাবেলাটায়, মন বসত।

ছেলেমানুষ!

এই ভাবেই কথা কয় শান্তা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না, হালকাভাবে একটু অঙ্গুলিনির্দেশ করে শুধু। বিষয়টার ওপর সামান্য একটু আলোকপাত করা, এই আর কী!

বিয়ে-থাওয়ার তো চেষ্টা করবেন না মেয়ের—অনুপস্থিত স্বামীর ওপর সব ঝালটা ঝাড়েন ভদ্রমহিলা।

বিয়ে! বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না আমি।

কৃষ্ণার মা দ্বিতীয়বার অপ্রতিভ হন। শান্তার ভাগ্যবিড়ম্বনাও কর্তার মেয়ের বিয়েতে অনুৎসাহের একটা কারণ।

তবু মেয়ে জিনিস।—অপ্রতিভ ভাবটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেন কৃষ্ণার মা: বিয়ে তো দিতেই হবে।

তা তো সত্যি।

এ প্রসঙ্গের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেয় শান্তা।

এ সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ সাংসারিক কথা সহ্য করতে পারে না সে।

পার্থকে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ কিছু বলেছ!

আর ক'দিন পরে গৃহিণীর প্রতি এই অভিযোগটি আনেন কৃষ্ণার বাবা।

বললাম আবার কখন? অভিযুক্ত ব্যক্তি সরবে অভিযোগ অস্বীকার

করেন : ঘরে ঘরে নিজেরাই যা বলাবলি করেছি, একটি অক্ষরও তার সামনে বলি নি।

তবে হঠাৎ এরকম একেবারে আসা বন্ধ করে দিল, মানে কী? রোজ আসত।

সে তো আমিও দেখছি। এখনকার ছেলেরা চালাক তো কম নয়? মুখ দেখে মনের কথা টের পায়।

উহু।—কর্তা অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়েন : পার্থ সে ধরনের ছেলে নয়। তোমরা 'ইয়ে' কর বটে, আমার কিন্তু ছেলেটাকে মানে—ভারি সাদাসিধে ছেলেটা।

গিন্নী সায় না দিয়ে পারেন না : তা আমারও মনে হয়। তবে সব দিক না দেখলেও তো চলে না। বয়সের ধর্ম বলে তো কথা আছে একটা!

যেতে দাও ওসব বাজে কথা।—মেয়েলী মন্তব্যে চটে ওঠেন কর্তা : আমি ভাবছি, একদিন যাব ওর মেসে। বিদেশ-বিভুঁয়ে একলা থাকে বেচারা, আসত এক-আধবার, বাড়ির ছেলের মত হয়ে গিয়েছিল।

মন-কেমন কি আমারই করে না?—নিজের হৃদয়বত্তার পরিচয় দেন কৃষ্ণা-জননী : করলে কী হবে? বোঝ না তো সব। এই যে মেয়ে সারা সন্ধ্যে ঠিকরে ঠিকরে ছাদে ছাদে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কারণ কী এর? লক্ষ্য করেছ কোনদিন?

খেয়েদেয়ে তো কাজ নেই আমার।—কর্তা সবিরক্তি মন্তব্য প্রকাশ করেন : তাই কে কখন ছাদে যাচ্ছে, আর কে কতক্ষণ রান্নাঘরে বসে আছে, তার তদ্বির করে বেড়াব! মোটকথা এই সামনের রবিবারে ওকে নেমন্তন্ন করে আসব আমি।

মেয়ের সম্বন্ধে এই সব অপচ্ছন্দকর আলোচনা বেশীক্ষণ বরদাস্ত করতে পারেন না ভদ্রলোক।

অবশ্য নেমন্তন্ন করাটা একেবারে নতুন কাণ্ড নয়। আগে আগে ছুটি-ছাটার দিন অথবা বাড়িতে 'ভালমন্দ' কিছু রান্না হলেই খেতে বলা হত পার্থকে।

তবে ইদানীং পার্থর এই 'হাজরে দেওয়া'র অবিচল নিষ্ঠায় সকলেরই (অবশ্য কৃষ্ণা বাদে) কেমন যেন একটা অবহেলা এসে গিয়েছিল।

আগে আগে কৃষ্ণার কাকা পার্থকে দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখতেন

না। সরকারের ভুল নীতি, উদ্বাস্তু-সমস্যা, আর চোরাকারবারী-সমস্যা, এইসব ধারালো অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এসে তর্ক জুড়ে দিতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তিনি আজকাল আর দেখা হলে কথাও কন না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যান।

নেমন্তন্ন করার পাট উঠেই গিয়েছিল।

বড় গলায় ঘোষণা করলেও সামনের রবিবারে আর নেমন্তন্ন করা হল না, কর্তার নিজেরই নেমন্তন্ন হয়ে গেল কাদের পুকুরে মাছ ধরবার।

তবে পনেরই আগস্ট করা হোক।—বললেন কৃষ্ণার মা, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে।

ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা নয়।—কর্তা বঁড়শিতে সুতো বাঁধতে বাঁধতে নিবিষ্টভাবে বলেন, কী হল ছেলেটার সেটাও তো খোঁজ নেওয়া দরকার, কিছু বল-টল নি বলছ যখন।

বলি নি আমি কিছু।—কৃষ্ণার মা আবার প্রতিবাদ জানান।

তুমি বল নি, শান্তা বলেছে।—কর্তা নিশ্চিত স্বরে বলেন।

শান্তা? কী যে বল তার ঠিক নেই। ও সংসারের কোন্ কথাটায় থাকে?

নিজের নামটা দু-দুবার কর্ণগোচর হওয়াতেই বোধ করি শান্তার 'সমাধি' ভাঙে। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বলে, আমাকে বলছ কিছু?

না, বলছি না কিছু—স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া সস্নেহে বলেন, তোর দাদার কথা শুনছিস? আমরা নাকি পার্থকে যা-তা বলে তাড়িয়েছি। শুনলে গা জ্বলে যায় না? বলেন কিনা—'তুমি না বল শান্তা বলেছে'।

আমি আজ পর্যন্ত পার্থর সঙ্গে কোন কথা বলি নি।

শান্ত নম্র গলায় শুধু এইটুকু বলে শান্তা। প্রতিবাদের তীব্রতা নেই, কেবল মাত্র জানিয়ে দেওয়া।

পনেরই আগস্ট সন্ধ্যাবেলায় আবার পার্থকে দেখা গেল এ ঘরে।

নেমন্তন্ন করলে আসবে না, এমন হাঁদা ছেলে সে নয়। একটু যে অপ্রতিভ ভাব প্রকাশ করবে, এমন নির্বোধও নয়। নিজেই দোষ স্বীকার করে: সন্ধ্যার দিকে একটা টিউশনি নিয়ে ফেলে এত মুশকিল হয়েছে মাসীমা, মোটে আসতে পারি নে।

রবিবারেও পড়াও নাকি ?—মাসীমা প্রশ্ন করেন।

তা অবশ্য নয়।—পার্থ হাসে : আলস্য এসে যায়। সপ্তাহে একটা মোটে দিন। আবার মজা দেখুন না, এ মাসে মেসের ম্যানেজার গিয়েছেন মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে, আর ম্যানেজারিটি দিয়ে গেছেন আমার স্কন্ধে। সে এক বিরক্তিকর ব্যাপার !

একেবারে নিশ্ছিদ্র কৈফিয়ত।

মঞ্জু অঞ্জু এসে আবদার ধরেছে : পার্থদা, অনেকদিন আস নি—হ্যাঁ, আজ নিশ্চয়ই একটা গল্প বলতে হবে।

হবে নাকি ? কিসের গল্প ? বাঘের ?

আড়চোখে একবার শাস্তার দিকে তাকায় পার্থ, বাঘের মাসী তো বসে আছেন সামনে।

কে জানে কৃষ্ণা কোথায় ? বাড়িতে আছে তো ? এতক্ষণের মধ্যে তো চুলের ডগাটাও দেখা গেল না মহারানীর। নাকি কর্তা-গিন্নীর কারসাজি ? মেয়েটিকে কোথাও চালান করে দিয়ে পার্থর সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা হচ্ছে।

বুড়ো-বুড়ীগুলো কী ঘোড়েলই হয় ! উঃ !

আসর ছেড়ে কৃষ্ণার মা ওঠেন।

মালাইকারির দফা কতটা গয়া করতে পারল ঠাকুর, দেখা দরকার।

জলযোগে'র-দই আনা যাক কিছু।—কর্তা জানান দেন : একটু বেরুচ্ছি আমি। বোস পার্থ।

বসব না ? পার্থ হেসে ওঠে : জলযোগের দই এসে পৌঁছবার আগেই পালাব ?...মনে মনে বলে, যান না একটু, কিছু দুঃখিত হব না। শুধু যদি কৃষ্ণার সন্ধানটা দিয়ে যেতেন।

ততক্ষণে পুরনো আবদারের জের টানছে মঞ্জু : বাঘের গল্প বিশ্রী, সেই ডিটেকটিভ মোহনের গল্পটা বল।

আচ্ছা। তার আগে কিন্তু একটু চা খাওয়াতে হবে—নইলে বুদ্ধি খুলবে না। ভেবে-চিন্তে বুদ্ধিটা আগেই খুলিয়েছে পার্থ।

চা তৈরি করবার ভারটা একান্তই যার নিজস্ব, যদি তার সন্ধান পাওয়া যায় এই ছুতোয়।

চা ? খুব পারব।—মঞ্জু মহোৎসাহে আশ্বাস দেয় : আমি তো আজকাল চা তৈরি করতে পারি। দিদি তো খালি তিনতলার ছাদে উঠে বসে থাকে।

কাকা এলে চা করে দিই আমি। দিই না রে অঞ্জু? দিদি নেবে এসে বলে, ওমা, কাকা এসে পড়েছেন। যাই—

আমিও পারি।—বলে দিদির পশ্চাদ্ধাবন করে অঞ্জু, পার্থকে নেহাতই অনাথ করে রেখে।

•

তিনতলার ছাদে।

এতক্ষণে রহস্য প্রকাশ হয়। আহা, অভিমানিনী কৃষ্ণা হয়তো পথের দিকে তাকিয়ে থাকে হতাশ দৃষ্টি মেলে। হয়তো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পার্থর কঠিন হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে।

এতটা না করলেও হত। পার্থ ভাবে, মুখের ওপর কেউ তো কিছু বলে নি পার্থকে। এক-আধদিন এলেও হত। বড্ড বেশী 'শো' করা হয়ে গেছে যেন, কর্তা নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এলেন!

কিন্তু পার্থর কাছে কি ছাদের দরজা একেবারেই বন্ধ? ঘরের ছেলের মত পার্থ গরম লাগলে ছাদে উঠে গিয়ে হাওয়া খেয়ে আসতে পারে না একটু?

অন্তত এক মিনিটের জন্যেও?

কৃষ্ণার মার রান্নাঘর তদারকি, আর কৃষ্ণার বাবার 'জলযোগ' থেকে ঘুরে আসার মধ্যবর্তী সময়টুকুর অবসরে কয়েকটা সিঁড়ি পার হওয়া কি একেবারে অসম্ভব?

অসম্ভবই।

পাথরের পুতুল পাহারা দিচ্ছে পার্থকে।

হায়, শান্তা যদি বিধবা না হত!

বর থাকলে অবশ্যই কৃষ্ণাকে আগলানো ছাড়া অন্য ডিউটি থাকত তার। শান্তা-বিহীন এই বাড়িটা কল্পনা করতে চেষ্টা করে পার্থ। 'নিষ্কণ্টক' কথাটা শুনতে ভারি খারাপ, না?

আড়চোখে একবার তাকাল পার্থ।

কোলের উপর পড়ে আছে খালি হাত দুখানা। কেন, পশমের গোলা কোথায় গেল শান্তার? কোথায় গেল লোহার কাঁটা? শুধু বসে থাকা শান্তাকে কেমন যেন নতুন লাগছে।

মিনিটের পর মিনিট কাটছে···ঘরে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আলোটা যেন বড্ড বেশী প্রখর।

এক পেয়ালা চা আনতে মঞ্জুর এত সময় লাগবে জানলে 'খাল কেটে কুমীর আনত' না পার্থ। এর চাইতে ঢের বেশী সহজ ছিল, 'ডিটেকটিভ্ মোহনে'র গল্প বলা।

দূর ছাই, না এলেই হত।

কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হবে না, আর বোকার মত বসে বসে একগাদা গিলতে হবে তাকে? হয়তো বা তারিফ করতে হবে মালাইকারি আর মাংসের কোর্মার। রাবিশ!

মনে করে তেতো হয়ে উঠছে মন।

এই নেমন্তন্ন করার মধ্যেও কোন কূটনীতি আছে কিনা কে জানে! হয়তো তাই। বোধ করি পার্থকে স্পষ্ট করে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া—দেখো তোমার অধিকারক্ষেত্র কতটুকু! এস বোস খাও দাও, কিন্তু খবরদার তার বেশী নয়। ওর চাইতে উঁচুতে নজর দিও না।

তবে কি এই অবসরে চলে যাবে পার্থ? কাউকে কিছু না বলে? যে যাই ভাবুক?

নাঃ, তা হয় না। ভদ্রতার দায় নাগপাশের মত আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ওর থেকে মুক্ত হবার ওষুধ সভ্য মানুষদের হাতে নেই।

যাক্‌গে, ঘর থেকে উঠে বারান্দায় গিয়ে হাঁফ ফেলা যাক একটু।

এরকম বিরক্তিকর অবস্থায় স্থির হয়ে বসে থাকা অসম্ভব।

উঠে পড়তেই পিছনে খস্‌খস্ শব্দ।

না, পার্থর নিজের পায়ের শব্দ নয়, শান্তার।

উঠে পড়েছে শান্তাও।

শোন, চলে যাচ্ছ?

পাথরের পুতুলের কণ্ঠে স্বর, আর সে স্বর এত দ্রুত এত লঘু এত ব্যগ্র?

অবাক হয়ে তাকায় পার্থ, আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ। বলছি, একদম আসো না কেন আর? দাদা দুঃখিত হন, বলেন—'বিশ্রী ফাঁকা লাগে সন্ধ্যেটা।' তোমার আসা অনেকটা নেশার মত হয়ে গিয়েছিল। এসো, বুঝলে? যেমন আসতে রোজ। আসবে তো?

আরও দ্রুত আরও লঘুভঙ্গীতে সেল্‌ফের ওপর থেকে পেড়ে নিয়েছে

শাস্তা পশম আর কাঁটা, অনেকদিন ধরে খোলা পড়ে থেকে ধুলো জমছিল যেটায়।

কিন্তু এতদিন অনভ্যাসে বোনার ঘরগুলো এলোমেলো হয়ে যায় নি? অমন নির্ভুল আর অত দ্রুত চলছে কী করে সরু সরু আঙুল কটি?

আর চোখ? চোখের জন্যে যে কাজকর্ম সব বন্ধ হতে বসেছিল শাস্তার! আলোটা কত কম লাগত!

কোন্‌টার পাওয়ার বেড়ে গেল হঠাৎ!

আলোর, না চোখের?

॥ বাসনার নেশা ॥

ঘটনাটা যেমন আকস্মিক তেমনি নাটকীয়।

যে মহিলাটি বাইরে থেকে, প্রায় তাড়াখাওয়া জানোয়ারের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরে ঢুকে এসে 'আমাকে বাঁচান' বলে আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লেন, তাঁকে আমরা জীবনে কখনও দেখিছি বলে মনে হল না।

একটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, এবং তার আসার অপেক্ষায় বাইরের দিকের বসবার ঘরটায় দরজা খুলে আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনে বসে ছিলাম, হঠাৎ এমন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা হবে স্বপ্নেও ভাবা ছিল না।

আমি চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠলাম এবং স্ত্রী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মহিলাটি কিন্তু উপুড় হয়েই পড়ে আছেন, শুধু দীর্ঘনিশ্বাসে দেহটা ফুলে ফুলে উঠছে।

মিনিট খানেক পরেই আমার স্ত্রী তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন, কে আপনি? কী হয়েছে আপনার?

দেহটা আর-একটু ফুলে ফুলে উঠল শুধু।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলাম। অর্থাৎ, আর কিছু নয়, পাগল। পাগলামির ঝোঁকে খোলা দরজা পেয়ে ঢুকে পড়েছে।

এখন কী করা যায়?

কী আর করা যায়!

ভুলিয়ে-ভালিয়ে বিদায় করা।

অতএব নরম ভাবে বলি, উঠুন, মাটি থেকে উঠুন, শুনি আপনার কী হয়েছে!

তথাপি নীরবতা। শুধু নিশ্বাসটা দ্রুততর হল।

এই দেখুন কী মুশকিল! কী হয়েছে না বললে—

এবার একটু কম্পন।

একজন মহিলার পক্ষে অপর কোন মহিলার অশোভনতা বা সোজা বাংলায়

'আদিখ্যেতা' সহ্য করা কঠিন। তা সে অপরাধিনী পাগল হলেও। কাজেই আমার স্ত্রী ঝেঁজে ওঠেন। বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, হয়েছে কী আপনার?

কম্পন প্রবলতর হল। অর্থাৎ আবেগ সমাপ্তির পূর্ব অভিব্যক্তি।

বাড়ির গৃহিণী ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, দেখুন, এটা বাইরের ঘর, এখুনি লোকজন আসবে, এভাবে শুয়ে থাকলে চলবে না।

এবারে ক্রন্দনরতা উঠে বসেন এবং ঘোমটাটি টেনে দেন। তবু সেইটুকু অবসরেই বোঝা গেল, মহিলাটির বয়েস হয়েছে। ভঙ্গীর সঙ্গে বয়সের অমিল। রঙ ফরসা, মুখের গড়ন একটু পুরুষালী 'কাঠ-কাঠ'।

কোথায় থাকেন আপনি?

প্রশ্নোত্তর চলে উভয় পক্ষে।

কোথায় থাকি? ভগবান যখন যেখানে রাখেন।—আর-এক দফা দীর্ঘশ্বাস।

এদিকে তো কই কখনও দেখি নি!

না, এদিকে কখনও আসি নি ভাই। কিন্তু এসে পড়ে যা শিক্ষা হল। উঃ!

কার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন?

কার সঙ্গে? এ জগতে আমার কোনও সঙ্গী নেই, একাই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কী বদ আপনাদের পাড়া! ভাবলে গা শিউরে উঠে। এই সন্ধ্যে রাত্তিরে—ছি-ছি!

আমার স্ত্রীর ভ্রূযুগল যাকে বলে কুঞ্চিত হয়ে উঠল, বলা বাহুল্য আমারও চোখের তারা কিঞ্চিৎ ট্যারা হয়ে আসে। এ আবার কেমনধারা কথা!

স্ত্রী ঝাঁজের সঙ্গে বলে ওঠেন, কেন, আমাদের পাড়া কী দোষ করল?

মহিলাটি এবার মুখ তুলে আমাদের দিকে একটি সজল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে মাটিতে নখের আঁচড় দিতে দিতে বলেন, সে বড় লজ্জার কথা ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন চমকে উঠলাম।

আর মুহূর্ত্তের মধ্যে বিস্মৃতির একটা পুরু পর্দা সরে গিয়ে প্রায় দু যুগ আগের একটা দিনের দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল।

দু যুগ? তা হবে বইকি। তখন তো আমি কলেজে পড়ি। একটা বোবা অনুভূতি যেন প্রকাশের দরজায় মাথা খুঁড়তে চাইছে। একটু আগে মনে হয়েছিল, এই মহিলাটিকে জীবনে কখনও দেখি নি, সে ধারনাটা কি পাল্টে যাচ্ছে?

কোথাও যেন দেখেছি কি?

কোথায় দেখেছি তবে?

কিন্তু তাই কি সম্ভব? সে কোথায়, আর এ কোথায়? অথচ এই ভাষা এই স্বর এই ভঙ্গী।

আর মুখ?

বোবা অনুভূতিটা ঠেলাঠেলি করতে থাকে।

কিন্তু সেই ভুলে-যাওয়া দিনটা কী অদ্ভুত স্পষ্ট হয়েই অকস্মাৎ চোখের ওপর ফুটে উঠল।

সময়টা—

বোধ করি রাত আটটা সাড়ে আটটা। নিজেদের বাড়ি নয়, পিসির বাড়ি, বহরমপুরে, কী একটা ছুটিতে বেড়াতে গেছি। সেদিন পিসিমার জামাই এসেছে, খাওয়াদাওয়ার বেশ সমারোহ আয়োজন চলছে। পিসেমশাই দালানে বসে জামাইয়ের কাছে বহরমপুরের পুরনো ঐতিহ্যের বহুবার-বলা গল্প আবার চালাচ্ছেন এবং আমি ক্যারমবোর্ড বিছিয়ে উসখুস করছি, কী করে জামাইবাবুকে পিসেমশাইয়ের কবল থেকে খসিয়ে আনা যায়।

সহসা অপ্রত্যাশিত এক নাটকীয় আবির্ভাব।

দিদি গো, আমায় বাঁচান।

একটি মেয়ে যেন ঝড়ের ধাক্কায় আছড়ে এসে পিসিমার পায়ের কাছে পড়ল।

পিসিমা কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, কে? কে গা তুমি?

উত্তর এল না, শুধু একটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন নারীদেহ আবেগে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল চার জোড়া চোখের সামনে।

ও মা, এ কে গো? পাগল না কী? এ আবার কী ঝঞ্ঝাট!—পিসীমা ডুকরে উঠলেন। আমি আর জামাইবাবু হতচকিত।

পিসেমশাই এসে কিছু কঠোরভাবে এবার এগিয়ে বললেন, কে বাছা তুমি, কী চাও?

মেয়েটি এবার উঠে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে চার জোড়া চোখের সামনে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল, মেয়েটি সুন্দরী তরুণী এবং বিধবা। মুখের গড়নে

কিছু সৌকুমার্যের অভাব থাকলেও, বয়েসের লাবণ্যটা তো আছেই, তা ছাড়া রঙ রীতিমত ফরসা।

এ-রকম একটি মেয়ের এ-রকম অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব খুবই আশ্চর্যজনক বইকি। তা হলে কি সত্যিই পাগল?

কী, হয়েছে কী তোমার?—পিসেমশাই বলেন।

মেয়েটি এবার উপস্থিত সকলের মুখের উপর একটি সজল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই মাথাটা নিচু করে মাটিতে নখের আঁচড় কাটতে কাটতে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, সে বড় লজ্জার কথা দাদা!

পিসিমা অবশ্যই রীতিমত ক্রুদ্ধ হন, হবার কথাও। তিনি বলে ওঠেন, তা আমার বাড়িতে সে সব কথা কেন বাপু? আমরা তো তোমাকে সাতজন্মেও চিনি না।

আমি এখানকার মেয়ে নই দিদি।

মেয়েটির চোখ দিয়ে দুটি ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে।

পিসিমা কিঞ্চিৎ নরম স্বরে বলেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এখানকার আর কাকে না চিনি আমি! তা কোথাকার মেয়ে তুমি? এমন একলা ঘুরছই বা কেন?

ত্রিভুবনে আমার কেউ নেই দিদি।

বলি, কারুর না কারুর বাড়ির ঝি-বউ তো বটে? এ বয়সে এমন একলা পথে ঘুরছ, মানে কী?

মেয়েটি মাথা হেঁট করে বলে, সে লজ্জার কথা কী করেই বা বলি দিদি?

পিসিমা ঈষৎ চোখের ইশারায় আমাদের বলেন, তোমরা একটু ও-দিকে যাও তো।

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ভঙ্গীতে বলে ওঠে, থাকুন, থাকুন, ওঁরা আমার বড় ভাইয়ের মত। দুঃখীর আবার লজ্জা! তিন কুল খেয়ে ত্রিবেণীতে দূর-সম্পর্কের এক মামাশ্বশুরের সংসারে গিয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু টিঁকতে পারলাম না দিদি। মামাতো ভাওরের কুদৃষ্টির ভয়ে পালিয়ে কাশী চলে যাচ্ছিলাম, আমার মায়ের গুরুর কাছে—

পিসিমা বাধা দিয়ে বলেন, কাশী যাচ্ছিলে? তা এখানে কোন্ দিক দিয়ে? বললে যে ত্রিবেণী থেকে?

মেয়েটি ঢোক গিলে বলে, সেই কথাই তো বলছি। যাচ্ছিলাম তো,

কিন্তু এ হতভাগীর পোড়া কপালে যেখানে যাই কুদৃষ্টি! রেলগাড়িতে একটা লোক এমন করে তাকাচ্ছিল যে ভয়ে ভয়ে যেখানে-সেখানে নেমে পড়ে অন্য গাড়িতে উঠে বসলাম। তারপর—

মেয়েটি আর একবার ঢোঁক গিলে বলে, এখানেও সেই বিপদ। ইষ্টিশান থেকে একটা লোক পিছু নিয়েছে। যে রাস্তায় যাই সেই রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে আসে, যতবার পিছু ফিরে তাকাচ্ছি, বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। শেষে কী আর বলব দিদি, যখন ধরে ফেলে আর কী, তখন একেবারে চোখ কান বুজে ছুট মেরে এই আপনার পায়ে এসে পড়লাম।

মেয়েটি এই ক্লেশকর ইতিহাস বলতে যেন হাঁপাতে থাকে।

একটা জিনিস বরাবরই দেখেছি, মেয়েরা মেয়েদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে নিতান্ত নারাজ, কাজেই পিসিমাও বেজার মুখেই বলেন, তা তোমার মত বয়সের মেয়ে এমন করে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ালে বিপদ আছে, এ তো কচি ছেলেটাও জানে। ঘরে যতই অসুবিধে হোক, ছাতের তলায় মাথা রেখে টিঁকে থাকাই উচিত।

সত্যি কথা বলতে কী, পিসিমাকে সেদিন মোটেই মহিয়সী মহিলা মনে হয় নি। আহা বেচারা, কত লাঞ্ছনা কত গ্লানি সয়ে তবেই না এমন করে উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে পড়েছে। দেখলাম, জামাইবাবুও বেশ বিচলিত।

মেয়েটির চোখ দিয়ে আর দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মাথা নিচু করে বলল, উপায় থাকতে বেরোই নি দিদি, ধর্ম বজায় রেখে বাস করা অসম্ভব হল বলেই—

পিসেমশাই সহসা বলে ওঠেন, তা বাছা, তুমি আমার বাড়ি থাকবে?

এত ভাগ্য কি আমার হবে দাদা? একটু ভাল আশ্রয় পেলে, আমি—

কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে বেচারার।

তবু 'দাদা' শব্দটা কানে যেন একটা কেমন-কেমন ঠেকছিল, 'বাবা' বললেই যেন শোভন হত। আর বয়েসেও তো প্রায় পিসেমশাইয়ের মেয়েরই বয়সী। জানি না, পিসিমার মনেও এই 'দাদা' শব্দটা কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল কি না! তিনি ঝেঁজে উঠে বললেন, ও আবার কী কথার ছিরি? থাকবে মানে?

আহা, থাকবে মানে আর কী, বাড়ির মেয়ের মত থাকবে। শান্তিটা তো

এবার পাকাপাকি শ্বশুরঘর করতে চলে যাবে, তুমি নিছক একা পড়বে। তবু একটু সাহায্য-টাহায্য—

মনে মনে ভাবলাম, উঃ, ভদ্রলোক কী ঘুঘু! লোকের বিপদের সুযোগে নিজের সুযোগ খুঁজছেন। বিনি মাইনেয় যদি একটি দাসী মিলে যায়!

পিসিমা সহজে নরম হবার মেয়ে নয়, তাই তেমনি ভাবেই বলেন, অমনি যা হোক একটা বলে ফেললেই হল? কী ঘরের মেয়ে তা জানা নেই শোনা নেই—

ঘর ভালই দিদি, মুখুজ্জেদের মেয়ে আমি, চাটুজ্জে ঘরের বউ, শুধু ভাগাটাই ভাল নয়।—নরম আর কাতর ভাবে বলে মেয়েটি।

পিসেমশাই পিসিমার প্রতি একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মহোৎসাহে বলে ওঠেন, তবে তো আর কথাই নেই। রান্নাবান্না সবই পারবে। তোমার এই নিত্যি রোগের শরীর, ভালই হল। এখানেই তুমি আশ্রয় পেয়ে গেলে বাছা। মায়ের মত দেখবে ওঁকে—

মেয়েটি হঠাৎ পিসেমশাইয়ের দুই পায়ের উপর দুমড়ে পড়ল এবং রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে এইটুকু শোনা গেল, বাঁচালেন দাদা, ভগবানই মিলিয়ে দিলেন আপনাদের। তাই তো বলেছিলাম, বড় ভাইয়ের মত আপনারা—

থাক্ থাক্।—পিসেমশাই পা ছাড়িয়ে নিয়ে হেসে ওঠেন: তা বলে সবাই ভাইয়ের মত নয়, এরা দুজন হচ্ছে—আমার জামাই আর শালার ছেলে।

দুর্গা দুর্গা! সন্ধ্যেবেলা এ কী বিভ্রাট!—পিসিমা রান্নাঘরে ঢুকে যেতে যেতে বলেন, গেল বোধ হয় ডালটা পুড়ে! অমন করে গলদা চিংড়ি দিয়ে ডাল চড়ালাম।

শান্তি বাড়ি ছিল না, সইয়ের বাড়ি না কোথায় গিয়েছিল, সে এসে সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হাঁ! কিন্তু ও এসেই সুরাহা হল। কেমন টুক করে আলাপ করে ফেলে মেয়েটাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে কুয়োতলা দেখিয়ে দিল, নিজের শাড়ি জামা পড়তে দিল!

শাড়ী?

তা হোক, একদিন শাড়ি পরলে আর জাত যাবে না তোমার।

প্রবল প্রতিবাদে ওর প্রতিবাদ উড়িয়ে দিল শান্তি।

শান্তি আমি সমবয়সী, কাজেই জামাইবাবু কোন্ না সাত-আট বছরের বড় আমার চাইতে, তাই জামাইবাবুই বলি।

জামাইবাবু ঘরে এসে বললেন, যাই বল শৈলেন, এটা এঁদের খুব অন্যায়। ভদ্রঘরের মেয়ে, বিপদে পড়ে এসেছে, তাকে আশ্রয় দেবার মহত্ত্ব থাকে, দিন। তা নয়, কায়দায় পেয়ে ঝি-রাঁধুনীর পোস্টে বসিয়ে দিলেন। একে আশ্রয় দেওয়া বলে না, সুযোগ নেওয়া বলে।

শান্তি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, নিজের মা গুরুজন, তবু বলি মার কাছে কি আর টিঁকতে পারবে? তার চাইতে—গলাটা একটু নামিয়ে বলে—আমাদের ওখানে নিয়ে গেলে কেমন হয়? খোকাটাকে একটু ধরল-টরল—মানে আর কী—মাসি-পিসির মতই ধরার কথা বলছি। আমি তা হলে একটু আসান পাই, ওরও—

জামাইবাবু গম্ভীরভাবে বলেন, সে কথা আমিও ভেবেছিলাম। কিন্তু না, থাক্। তাতে আবার অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

আমি মনে মনে হাসলাম।

মনে পড়ল, আমার দিদিমা যখন-তখন ব্যঙ্গচ্ছলে একটা কথা বলেন বলেন, আহা, কেন পাখিটাকে মেরে জীব হত্যে করছিস? আমায় দে, আমি পুড়িয়ে খাই।

সেই রাত্রেই খাওয়াদাওয়ার সময় দেখলাম, নবাগতা দ্রুতভঙ্গীতে এটা ওটা কাজে পিসিমাকে সাহায্য করছে। জল দিয়ে গেল, আসন পাতল, রান্নার দালান থেকে বাসনপত্র আনল।

পিসেমশাই পুলকিত চিত্তে চুপি চুপি বললেন, দেখলে তো শৈলেন, কেমন রত্নটি আবিষ্কার করলাম! এ যা দেখছি, এর পর তোমার পিসিমাকে আর নড়ে বসতে হবে না।

এই তো গেল প্রথম রাত্রের কথা।

তারপর শেষরাত্রে? শেষরাত্রে সেই ভয়াবহ কাণ্ড!

সে কথা মনে পড়ে এখনও গাটা কেমন গুলিয়ে উঠল।

মেয়েটির নাম যতদূর মনে পড়ছে, বোধ হয় বীণাপাণি। সে যাই হোক, রাত্রে তাকে পিসিমা ভাঁড়ার-ঘরের ছোট চৌকিটার ওপর শুতে দিয়েছিলেন, এবং এ কথাও মনে আছে, এ ঘরে এসে পিসেমশাইকে বলেছিলেন, ভাঁড়ার-

ঘরে তো শুতে দিলাম, ভগবান জানেন চোর কি ছ্যাঁচোড়। সদর-দোরটায় একটা তালাচাবি দাও দিকি। সরে পড়তে পারবে না।

মানুষকে তুমি বড্ড সন্দেহ কর।—পিসেমশাই বিরক্ত চিত্তে তালা লাগাতে যেতে যেতে বলেন, ছেলেমানুষ একটা মেয়ে, ভদ্দরের মেয়ে, তবু কী করে যে এ মনোভাব আসে তোমাদের ?

পিসিমা ঠোঁট উল্টে বলেন, ইস্! 'দাদা' বলে ডেকেছে কিনা, তাই একেবারে গলে গেছেন !

ভাবলাম, সত্যি মানুষ কী নীচ !

আর শেষরাত্রে মনে হয়েছিল, উঃ, মানুষ কী শয়তান।

কিন্তু কে শয়তান ?

মানে সেদিনের শয়তানির নায়ক কে ছিল ?

সে রহস্য ভেদ হয়নি। সেদিন না, কোনদিনও না। শুধু সেদিন আমরা তিনটি পুরুষ পরস্পর পরস্পরের দিকে এক সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম বার বার।

শান্তি তাকিয়েছে তিন জনের দিকেই ভয় লজ্জা দিশার আর ঘৃণার দৃষ্টিতে। পিসিমা অগ্নিদৃষ্টিতে আমার আর জামাইয়ের দিকে। ঈশ্বর জানেন, আমি কেন বাদ পড়েছিলাম।

হ্যাঁ, শেষরাত্রের দিকে একটা আর্ত চিৎকার উঠে ভাঁড়ার ঘর থেকে। দুর্বল অসহায় নারীকণ্ঠের। তার আগে খাট থেকে 'ধপ' করে পড়ে যাবার একটা শব্দ।

একটুক্ষণ কান খাড়া করে থাকতে থাকতেই সারা বাড়িটায় একটা চাঞ্চল্য উঠল—শেষরাত্রের মধুর শুব্ধতা ছিঁড়ে খুঁড়ে। আলো জ্বলে উঠল এ-ঘরে ও-ঘরে, দরজা খোলা হল সব ঘরের।

শুনলাম, প্রথমটা পিসিমা বলছেন, বোধ হয় বেড়াল। দস্যি একটা বেড়াল জানলা দিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ে মাঝে মাঝে।

বেড়াল আর মানুষে তফাত বুঝতে পারব না দিদি !

ক্ষীণ দুর্বল অসহায় একটি প্রতিবাদ।

তুমি নিজেই বাপু মেয়ে ভাল নও।—পিসিমা বজ্রকণ্ঠে বলেন, আমার বাড়িতে একটা বামুন চাকর, কি বাজে বাইরের লোক কেউ নেই—

আমার কপাল দিদি। আমার পোড়া কপালে মুনিরও মতিভ্রান্তি হয়।

কপালে করাঘাত করেছিল বীণাপাণি।

শান্তি একটু এগিয়ে গিয়ে পাকাগিন্নীর মত দাঁতে দাঁত চিপে বলল, ওসব তোমার বানানো কথা। কোনদিন কারও মতিভ্রান্তি হল না, আর আজ—

বললামই তো ভাই, আমার ভাগ্য।—বীণা আঁচলে চোখ মুছে বলে, আর কোনদিন কি এ রকম একটা বেওয়ারিশ মেয়েই ছিল তোমাদের সংসারে? রূপের কথা আর তুলব না ভাই, তবু বয়েসটাও তো ফেলনা নয়।

না, ঝাঁটা পিসিমা সত্যি মারেন নি, শুধু বলেছিলেন, ঝাঁটা মেরে দূর করলেও আমার রাগ যাবে না।

শেষ রাত্রের অন্ধকারেই দূর করলেন তাকে পিসিমা।

আর সকালবেলা চলে গেলেন জামাইবাবু থমথমে অন্ধকার মুখ নিয়ে। অথচ দিন চার-পাঁচ থাকবার কথা ছিল তাঁর।

আমারও পুরো ছুটিটা ওখানেই কাটাবার কথা ছিল, ফিরে এলাম, দু-তিন দিন পরেই। সত্যি বলতে কী, পিসেমশাইয়ের বাড়িতে গিয়ে ছুটি কাটাবার প্রবৃত্তি আর কখনও হয় নি। আর জামাইবাবুর সঙ্গে জীবনে আর কখনও ভাল করে মিশতে পারি নি। কেন বলতে পারে কে? সন্দেহ যে কুয়াশাচ্ছন্ন।

কিন্তু সে ঘটনার সঙ্গে আজকের ঘটনার সম্পর্ক কী? অথচ মনে পড়ে গেল।

ভঙ্গীটা বড় বেশী একরকম।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, শুনলাম আমার স্ত্রী জেরা করছেন, কী করতে বেরিয়েছিলেন আপনি? আর এ পাড়াতেই বা এসেছিলেন কেন?

সে বলতে গেলে মহাভারত।

কিন্তু ছেলেছোকরারা আপনার দিকে কুদৃষ্টি দেবে, এ কী একটা কথা হল? সে বয়েস আপনার আছে?

হায় ঈশ্বর! কথায় বলে, পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই। পুরুষ জাত হচ্ছে বাঘের জাত, বুঝলেন ভাই।

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল, কী একটা বলতে যাচ্ছিলাম বলা হল না। প্রত্যাশিত বন্ধুবর সহাস্যে এসে ঘরে ঢুকলেন এবং 'বড্ড

দেরি হয়ে গেল ভাই' বলতে গিয়ে আধপথে থেমে গিয়েই মহিলাটির দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বলে উঠল, এ কী, এঁটি আবার কোথা থেকে এসে জুটলেন ?

মুহূর্তের জন্য আমার সঙ্গে বন্ধুর, বন্ধুর সঙ্গে আমার স্ত্রীর, এবং স্ত্রীর সঙ্গে উৎপীড়িতা মহিলার একটি চকিত দৃষ্টি-বিনিময়। পরক্ষণেই মহিলাটি তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে একেবারে রাস্তায়।

ব্যাপার কী ?—একসঙ্গে সস্ত্রীক চেঁচিয়ে উঠি, চেনো না কি ওকে ?

ওকে আবার কে না চেনে ?—বন্ধু বসে পড়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, আমাদের হাওড়ার ওদিকে সকলকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়ে, এবার এদিকে এসেছে বোধ হয়।

স্ত্রী গম্ভীরভাবে বলেন, জ্বালাবার পদ্ধতিটা কী ?

আর বলেন কেন ?—বন্ধু একটু সরস হাসি হাসেন : ও বুড়ীর বক্তব্য বিষয় হচ্ছে রাজ্যসুদ্ধু লোক ওর দিকে কুদৃষ্টি হানছে। হুড়মুড়িয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি ঢুকে পড়ে বলবে—ওই আমায় ধরতে আসছে। দেখুন তো কী কদর্য কাণ্ড! নিজের বয়সের দিকে তাকা, তা নয়। আসলে ওই ওর পেশা।

এতে কিছু উপার্জন হয় ওর ?—প্রশ্ন করি আমি।

বন্ধু মাথা চুলকে বলেন, উপার্জন ? না, উপার্জনের কথা কিছু শুনি নি। বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো বাজে কথা বলে এই পর্যন্ত। পয়সাকড়ি চাইতে দেখি নি।

মৃদু হেসে বলি, তা হলে আর পেশা বলছ কেন ? বরং বলতে পার নেশা।

তা বটে। সেটাই ঠিক। এ এক রকম অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব আর কী !

বন্ধু সহজেই সকল সমস্যার সমাধান করে দেন, কিন্তু আমার মনটা যেন কোন একটা রহস্যময় রাত্রির অতীতে হারিয়ে গিয়ে 'হায় হায়' করতে থাকে। কোথায় যেন কী ভয়ানক একটা অবিচার হয়ে গেছে !

সত্যিই কি এমন অদ্ভুত নেশা থাকে মানুষের ? সে নেশা পুরনো হয় না ? নাকি জীবনের একটা তীব্রতম বাসনা যার কোনদিনই পূর্ণ হয় না, সে সেই বাসনা মেটানোর খেলা খেলেই সুখ পায় !

॥ কাচের দেওয়াল ॥

অবশেষে ওরা গেল।

অনেক বকে, অনেক বকিয়ে, অনেক হেসে, অনেক হাসিয়ে, নিজেরা জ্বলে আর এদের জ্বালিয়ে, শেষ অবধি মধ্যরাত্রি পার করে তবে এদের রেহাই দিল। বলে গেল, চললাম বাবা, আর থাকলে গাল দেবে তোমরা।

বিয়ের বর-কনেকে জ্বালিয়ে মারবার প্রথা আমাদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশে আছে কি না এবং প্রথাটা কত বর্বর—সেই নিয়ে ছোট্ট একটু ভাষণ দেবে ঠিক করছিল দীপঙ্কর, কনের কাছে মুখরক্ষার্থে। কারণ এটা দীপঙ্করদের বাড়ি। আর দীপঙ্কর স্বপ্নেও জানত না যে, ওর বাড়ির সেই শান্তশিষ্ট মেয়েগুলো একটা সুযোগ পেয়েই এত বাচাল হয়ে উঠবে। সভ্য মানুষের অবদমিত বর্বরতাকে মাঝে-মাঝে মুক্তি দেবার জন্যেই যে উৎসব ব্যাপারটার সৃষ্টি, সমাজসংগঠক চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরই বিশেষ চিন্তার ফল হচ্ছে—যত রাজ্যের উৎসব আর অনুষ্ঠান। এ-কথা কোনদিন তলিয়ে ভেবে দেখে নি বলেই বোধ করি দীপঙ্করের এই অবাক হওয়া। আর সেই জন্যেই বোধ করি তার বাসরঘরে চন্দ্রাবলীদের বাড়ির তরুণীদের উদ্দাম-উল্লাসকে 'অসহ্য' বলে মন্তব্য প্রকাশ করে বসতে বাধে নি।

এখন এদের বাচালতায় লজ্জায় লাল হয়ে সব সমেত এই প্রথাটাকেই নিন্দা করবে বলে কথা গোছাচ্ছে, এমন সময় নতুন কনে চন্দ্রাবলী ফুলের মালাটা গলা থেকে খুলে ফেলতে ফেলতে স্থির গম্ভীরভাবে বলে বসল, আপনার প্রেমপাত্রীটিকে দেখলাম।

এর আগে পাঁচজনের মধ্যে একবার 'আপনি' সম্বোধন শুনে দীপঙ্কর ভেবে রেখেছিল, ওইটা নিয়ে বউকে কিছু পরিহাস করবে। ভালই হল, আলাপ-আলোচনার জন্যে কিছু উপকরণ মজুত থাকল।

কিন্তু এখন আর 'আপনি' সম্বোধন কানে বাজল না। শেষ কথাটাই বাজের মত বাজল। চমকে উঠল দীপঙ্কর, ভীষণভাবে চমকে উঠল, বুঝি

বা মানে বুঝতেও কিছুক্ষণ লাগল। তারপর বুঝে-সমঝে খুব পরিষ্কার করে আস্তে বলল, তোমার কথাটার ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারলাম না।

না পারাটা আশ্চর্যের! মর্মস্থলে পৌঁছেছে অবশ্যই।—বলে বিছানা থেকে একটা বালিশ নামিয়ে নিয়ে নীচে কার্পেটের উপর শুয়ে পড়ল চন্দ্রাবলী।

রূপকথার কাহিনীতে আছে মায়াকন্যারা নাকি একটি মাত্র মন্ত্র পড়ে মানুষকে পাথর করে দিতে পারত। রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র কোটালপুত্রের দল শিকারে গিয়ে অরণ্যের মধ্যে সহসা সেই মন্ত্রে নিথর।

রূপকথার যুগ গিয়েছে, কিন্তু মায়াকন্যারা আজও আছে। আজও তারা পারে একটি মাত্র শব্দমন্ত্রে রাজপুত্রদের পাথর করে দিতে।

অনেকক্ষণ পাথর হয়ে বসে রইল দীপঙ্কর।

চন্দ্রাবলী এ সন্দেহ করল কী করে, সে-কথা ভেবে নয়, বসে রইল তার ভবিষ্যতের রঙ দেখে।

এ কী হল! কোথায় ছিল এই নাগিনী? দীপঙ্করকে ছোবল হানবার জন্যেই কি এতদিন বিষের পুঁজি জমিয়ে তুলছিল সে? জীবনটার চেহারা তবে কী হবে দীপঙ্করের?

উজ্জ্বল আনন্দময় একটা কিছু হবে, এ আশা ছিল না অবশ্যই। তবু তো মেনে নিয়েছিল অবস্থাকে, সংকল্প করেছিল মানিয়ে নেবে নিজেকে, কিন্তু এই একটি মাত্র মন্ত্রেই যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল সে-সংকল্পের বনেদ।

অনেকক্ষণ পরে মনে এল, চন্দ্রাবলী এ সন্দেহ করল কেন! কে বলল? আরতির পক্ষে কি সম্ভব? নাঃ, সে সম্ভব নয়। কিন্তু আর কেই বা? যে বালুনদী বরাবর বালুকণার আস্তরণের নীচ দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে, কোনদিন উদ্ঘাটিত হয় নি, তার সন্ধান অপরে দেবে কী করে?

তবু—আরতি? অসম্ভব।

ডেকরেটরদের লোক এসে অনেক আড়ম্বরে ঘরটা সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে। কারণ দীপঙ্কর বাড়ির ছোট ছেলে। হোক তার বয়েস ত্রিশোর্ধ্বে, তবু ওপরওলাদের সাধ বাধা মানবে কেন?

ঘরটা রেশমে মখমলে পর্দায় কার্পেটে ফুলে আলোয় ভারাক্রান্ত, তার মাঝখানে শুধু চন্দ্রাবলীকেই দেখাচ্ছে—পাখির মত হালকা। ছোট হালকা শরীর, শুয়ে আছে গুটিয়ে-সুটিয়ে ছোট্ট হয়ে, পরনের শাড়ি-ব্লাউজগুলোও

যেন প্রজাপতির ডানার মত হালকা কোমল পেলব। চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্কের মত সম্পূর্ণ অবান্তর একটা কথা ভাবল দীপঙ্কর।

এ-কাপড়কে কী বলে? সিল্ক? শিফন? নাইলন? বিয়ের বাজারের সময় এই শব্দগুলি বার বার কানে এসেছিল। কিন্তু ওই সুকুমার আবরণের মধ্যে এমন কাঠিন্য আশ্রয় নিয়েছে কী করে?

দীপঙ্কর অবশ্য পারে ওকে অবহেলা করতে, ওকে বাদ দিয়ে নতুন করে নিজের জীবনের ছক কাটতে, যে ভুল হয়ে গিয়েছে, সেটা ছাড়া অন্য ভুল না করতে, কিন্তু তার আগে তো জানতেই হবে চন্দ্রাবলীর এ-সন্দেহ হল কোন্ সূত্রে!

জানতেই হবে। না জানলে চলবে না দীপঙ্করের।

খাট থেকে তাই নেমে এল দীপঙ্কর।

চন্দ্রাবলীর কাছাকাছি বসে পড়ে বলল, তোমাকে একটা কথা অন্তত সোজা স্পষ্ট বলতে হবে।

চন্দ্রাবলী ঘুমের ভান করল না, ভান করল না অভিমানের, স্পষ্ট সুরেই বলল, জানি কী জানতে চান। তার উত্তর হচ্ছে, ও-কথা কাউকে বলে দিতে হয় না।

দীপঙ্কর তীব্র স্বরে বলে উঠল, তোমার বয়েস কত শুনতে পারি?

স্বচ্ছন্দে। ছাব্বিশ।

ছাব্বিশ!—আশ্চর্য হল দীপঙ্কর, দেখে মনে হয় কুড়ির নীচে।

এর পর আর তো বলা চলে না—এত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে কবে? কিন্তু ছোবল কি শুধু নাগিনীরাই হানে?

দীপঙ্করের মুখের পেশীতে একটা কুঞ্চন দেখা দেয়, যেটাকে নাকি হাসিও বলা চলে।

আলাপ হল আমার প্রেমপাত্রীর সঙ্গে?

চন্দ্রাবলী উঠে বসল। রঙিন আলো ছড়িয়ে রইল ওর মুখে চোখে সর্বাঙ্গে। ঝিকিয়ে উঠল গায়ের নতুন গহনা। বলল, হল বইকি।

কেমন লাগল?—আর-একটা কুঞ্চন দীপঙ্করের মুখের পেশীতে।

চন্দ্রাবলী একটু তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলল, আর যাই হোক, পছন্দর প্রশংসা করা চলে না।

সে-ত্রুটিটা তো অপর ক্ষেত্রে শুধরে নেওয়া গেছে।—দীপঙ্কর উঠে দাঁড়িয়ে একটা হাই তোলার ভঙ্গী করে বলল, মন্দ হল না! দুটো মিলিয়ে একটাই হল।

তার মানে?—অসতর্কে বলে ফেলল চন্দ্রাবলী।

মানে আর কী?—বিছানায় শুয়ে পড়ে দীপঙ্কর বালিশটা কাত করে বসিয়ে নিয়ে আর-একটা হাই তুলে বলল, একবারের সওদা দেহবিহীন হৃদয়, আর একবারের সওদা হৃদয়বিহীন দেহ, অতএব—

ইতর!

অস্ফুট এই শব্দটা কি কানে এল দীপঙ্করের? আর কানে এল বলেই কি মুখের পেশীর বিকৃতিটা একটু বেশী স্পষ্ট হল?

দু বাড়ির লোক অবাক হয়ে গেল দীপঙ্করের নতুন সিদ্ধান্ত শুনে। এটা কী হল? যে-লোকটা বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে বিয়ে করতে, সে ছুটির শেষে ফেরবার সময় বউকে নিয়ে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। স্থিরও ছিল তাই। কিন্তু দীপঙ্কর একলা যেতে যায়।

কেন? কেন?

এমনি। থাকুক না শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে, শিক্ষা-সহবত হোক। ইচ্ছে না হয়, মা-বাপের কাছে থাকুক গে। দীপঙ্করের তো কোন অসুবিধে নেই ওখানে। অদ্ভুত ভাল চাকর-বাকর রয়েছে।

চাকর? তাতে সব হবে?

কেন নয়? এ যাবৎ তো বেশ চলে যাচ্ছিল।

কেউ বলল 'ঢং', কেউ বলল 'আদিখ্যেতা', কেউ বলল 'মান-অভিমানের পাঠ নেওয়া হচ্ছে।' বলল অবশ্য বেশীর ভাগ চন্দ্রাবলীর কাছেই। আর, যাবার আগের দিন দুপুরে চন্দ্রাবলী সরাসরি দীপঙ্করের কাছে গিয়ে সোজাসুজি বলল, আমি বিলাসপুরে যাব।

বিলাসপুর যাবে! অর্থাৎ?—ঠিক বুঝতে পারল না দীপঙ্কর এটা কী। অভিভাবক-পক্ষের শিক্ষা? সে-শিক্ষা নিয়েছে চন্দ্রা?

চন্দ্রাবলী এক পলক দেখে নিয়েই বলল, না, কেউ কিছু শিখিয়ে দেয় নি আমায়। তারপর একটু হেসে উঠে বলল, আর খুব বেশী মন-কেমনও করছে না। শুধু যেটা লোকচক্ষে স্বাভাবিক, সেইটি করতে চাই।

আমার জীবনে স্বাভাবিকের স্থান কম।—বলল দীপঙ্কর।

চন্দ্রাবলী দৃঢ় গলায় বলল, সেটা আপনার ভাগ্য। তার জন্যে আমি কেন লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হব? সংসারের পাঁচজনের কাছে যেটা ঠিক, তেমনি জীবন আমি চাই, অন্তত দৃশ্যত।

দীপঙ্কর একবার দেখল তাকিয়ে ও-মুখের কোনখানে কোমলতার অথবা দুর্বলতার ছাপ আছে কি না! সেই দুর্বলতার ছল কি না এটা!

নাঃ। সে-মুখ কাচের পুতুলের মত সুন্দর আর কঠিন। মৃদু হেসে বলল, কিন্তু আমি যদি না চাই?

ভেতরের জীবনটা চলুক আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী, বাইরেটায় চলবে না।

অর্থাৎ আইনের দাবি মানতে হবে?—বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল দীপঙ্করের মুখে। কিন্তু এ-হাসি চন্দ্রাবলী দেখেও দেখল না, বলল, হ্যাঁ। আর সেটা অস্বীকার করতেও পারেন না।

তা অবশ্য পারি না। বেশ, ঠিক আছে। থাকতে পার চল।

স্বামীর সঙ্গে বিদেশে বাসায় আসার পটভূমিকা চন্দ্রাবলীর এই। সে-পটভূমিকায় ছবিটাও আঁকা হচ্ছে তেমনই। যেন একটা কাচের দেওয়ালের দু পাশে দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুজনে দুজনকে দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট নির্ভুল, শুধু কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না। অথচ এ-দেওয়াল ভেঙে ফেলবার গরজও নেই ওদের। বরং দেওয়ালের দু দিক থেকে আঘাত-প্রত্যাঘাতের খেলাটাতেই ঝোঁক বেশী।

এই সৃষ্টিছাড়া জীবনের সাক্ষী কেউ নেই, তাই বোধ করি কোনদিন কোন কারণেই পদ্ধতির পরিবর্তনও ঘটছে না।

এক দীপঙ্করের সেই অদ্ভুত ভাল চাকর রামলাল। তাকে আর কে গ্রাহ্য করছে? সে এখনও তেমনই ভাল। শুধু ওর কাজ বেড়েছে, একজনের জায়গায় দুজনের সেবা।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রার পদ্ধতিটা এই। সকালবেলা রামলাল চা দিয়ে যায়, দীপঙ্কর একা নীরবে বসে খায়, খেয়ে খবরের কাগজখানা মুখের সামনে তুলে ধরে। চন্দ্রাবলী ধীরে সুস্থে এসে বাকী পেয়ালাটায় দুবার করে চা ঢেলে খায়, তারপর উঠে গিয়ে গৃহিণীজনোচিত মর্যাদার ভঙ্গীতে চাকর-বাকরকে এটা ওটা নির্দেশ দেয়, রামলালকে 'বাবু'র খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে

বাহুল্য একটু উপদেশ দেয়, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বইপত্র সেলাই ইত্যাদি নিয়ে বসে।

চাকর-মহলে তাদের নিয়ে সমালোচনার স্রোত বয়, আর তাদের মাধ্যমে পাড়াপড়শীর বাড়িতেও। এ-দিকটায় অবশ্য বাঙালী বসতি নেই, দু-একজন যাঁরা আছেন, প্রথম প্রথম এসেছিলেন তাঁরা আলাপ করতে, কিন্তু চন্দ্রাবলীর হিম-শীতল অভ্যর্থনায় সে-চেষ্টা থেকে বিরত হয়েছেন তাঁরা।

দুপুরে বাড়িতে খেতে আসে দীপঙ্কর, লাঞ্চ বল তো লাঞ্চ, ভাত বল তো ভাত। বরাবরই আসে। মোটর-বাইকটার শব্দ হতেই রামলাল তটস্থ হয়ে টেবিল সাজায়, কুকারে চাপানো গরম ভাত থালায় ঢেলে পরিপাটি করে বাড়ে, দাঁড়িয়ে থাকে হুকুমের আশায়।

চন্দ্রাবলীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে কখন, ও তখন কোনদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুময়, কোনদিন বা বই পড়ে।

মোটর-বাইকের শব্দটা দুবার করে শুনতে পায়, এল আর গেল। সে-শব্দের ধাক্কায় কাচের দেওয়ালের গায়ে ফাটল ধরতে দেখা যায় না।

সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফেরে দীপঙ্কর, কোনদিনই তখন বাড়ি থাকে না চন্দ্রাবলী। বেড়াতে যায় এখানে সেখানে। হয়তো বা স্টেশন বরাবর। যখন ফেরে, তখন দীপঙ্কর বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছে।

আর রাত্রে?

রাত্রে নাকি মানুষ দুর্বল হয়ে যায়, বোকা হয়ে যায়, ব্যক্তিত্ব হারায়, মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে বসতে দ্বিধা করে না! রাত্রি ছলনাময়ী, রাত্রি নিষ্ঠুর, রাত্রির হাতে নাকি জাদুদণ্ড!

রাত্রির নামে এমন অনেক খ্যাতি আর অখ্যাতি আছে। কিন্তু এদের কাছে সেই অসীম শক্তিময়ীও হার মেনেছে। অথচ আয়োজনের তো অন্ত নেই তার! সে কোনদিন বা আনে জ্যোৎস্নার বন্যা, সে-বন্যার ঢেউ খেলে বাগানে উঠনে ঘরে, জানলার পথ ধরে বিছানায়, কোনদিন আনে অন্ধকারের নিথর রহস্য, অদৃশ্য কোন জগতে কোন মায়াবিনীর নূপুর বাজতে থাকে, তার শব্দ-শিহরণ গাছের পাতায় পাতায় দেওয়ালের গায়ে গায়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে, কোনদিন আলোছায়ার লুকোচুরিতে বাতাস চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু এদের ঘরের দরজা থেকে ফিরে যায় তারা মাথা হেঁট করে। এত আয়োজনেও দরজার খিল খুলে পড়ে না। আসে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের দুরন্ত

রাত্রি, আসে অসহায় হিমরাত্রি, আসে বাতাস-আছড়ে-পড়া শরৎ-বসন্তের এলোমেলো রাত্রি, এদের দরজার কপাট নড়ে না। বরং সে-সব রাতে খিল আটকানোর শব্দটা যেন একটু বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দুজনেই যেন কী এক যুদ্ধজয়ের সংকল্প নিয়ে মরণপণ করে বসে আছে, কেউ পরাজয় মানবে না।

কথা কি বন্ধ ওদের?

না, একেবারে বন্ধ কই? তা হলেও তো সেই অভিমানের ফাটল থেকে দেওয়াল ভেঙে পড়বার আশ্বাস থাকত। কথা বন্ধ নেই। কথা আছে। হয়তো কোনদিন দীপঙ্কর বলে, আজ ফিরতে রাত হবে।

চন্দ্রাবলী সেলাইয়ে চোখ রেখে বলে, আচ্ছা, রামলালকে বলব।

হয়তো চন্দ্রাবলী বলে, বংশী দেশে যাবার জন্যে ছুটি চাইছিল—

তাই বুঝি? কদিনের জন্যে?

তা ঠিক জানি না, তোমাকে বলতে বলেছিলাম, সাহস পাচ্ছে না।

সাহসের কী আছে! ছুটি দিয়ে দিও, অফিসের চাপরাসীকে বলে দেব, ওর সন্ধানে লোক থাকে।

হয়তো দীপঙ্কর বলে, তোমার বাবা আমায় চিঠি দিয়েছেন, অনেক দিন তোমায় দেখেন নি বলে—

চন্দ্রাবলী সহজভাবে বলে, আমাকেও লিখেছেন।

যেতে চাও তো ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

দরকার হবে না।

আমার ছুটি পেতে তো ঢের দেরি!

তাড়াই বা কী?

হয়তো দীপঙ্কর বলে, এ কী, তুমি রান্না করছ যে? রামলাল কোথা গেল?

কী দরকারে হঠাৎ বাজারে গেছে।

এত ব্যস্তর কী আছে? ও এলেই হত?

ব্যস্ত হই নি। ভাতটা পুড়ে যাচ্ছে কি না দেখতে এসেছিলাম।—বলে রান্নাঘর থেকে চলে আসে চন্দ্রাবলী। 'আপনি' গিয়ে বরং 'তুমি'টাও এসে গিয়েছে কথার পিঠোপিঠি।

এমনি করেই চলছিল। বোবা রাত্রি আর অসাড় দিনগুলো নিয়ে, কিন্তু

হঠাৎ এই জমাট অবস্থাটার উপর একটা ঢিল এসে পড়ল। একটা পোস্ট-কার্ডের চিঠি।

এ-চিঠি অপ্রত্যাশিত।

এ-চিঠি আরতির।

ও লিখেছে, অফিসের কী কাজে ওকে নাকি কয়েকটা দিনের জন্যে বিলাসপুরে আসতে হচ্ছে, অতএব কোথায় আর থাকবে, দীপঙ্কর ওখানে থাকতে? পারিবারিক একটা সম্পর্ক আছে, কাজেই প্রস্তাবটা অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। এই সম্পর্কের বালুস্তরের নীচে দিয়েই তো সহজ প্রবাহিত হতে পেরেছিল সেদিনের সেই ঝিরিঝিরি নদীটি।

চিঠিখানা দীপঙ্কর চন্দ্রাবলীর সামনে ফেলে দিয়ে বলল, কী উত্তর দেবে?

চন্দ্রাবলী চমকে তাকাল দীপঙ্করের দিকে, তারপর আবার পোস্ট-কার্ডটার দিকে, আর কোনদিন যা না করেছে তাই করে উঠল। হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।

দালান থেকে রামলাল চমকে উঠল, তারপর বুকে হাত দিয়ে বোধ করি একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চলে গেল বংশীকে খবর দিতে।

হাসি থামলে বলল চন্দ্রাবলী, আমায় জিজ্ঞেস করছ?

বিচলিত হল না দীপঙ্কর। মৃদু গম্ভীর হেসে বলল, জিজ্ঞেস করতে তো বাধ্য। বাড়ির গৃহিণী যখন।

তা বটে। ঠিক আছে, আসতে লিখে দাও।

দেবে?

আমার দিক থেকে কোনও বাধা নেই। ভয় নেই, অতিথির অমর্যাদা হবে না।

পোস্টকার্ডটা তুলে নিল দীপঙ্কর। একবার বুঝি যাবার জন্যে পা বাড়াল, তারপরই হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলে বসল, অতিথির অমর্যাদা হবে না, তা জানি। কিন্তু গৃহকর্তার?

চন্দ্রবতী একটু অবাক-অবাক চোখে তাকাল।

দীপঙ্কর আর-একটু কাছে সরে এসে একটু ঝুঁকে বলল, এই কটা দিন গৃহকর্তার মর্যাদারক্ষার ভার নিতে পার না?

কথাটার ঠিক মানে বুঝছি না।

দীপঙ্কর বোধ করি একটু ইতস্তত করল, কয়েক পা পায়চারি করল,

তারপর হঠাৎ খুব কাছাকাছি এসে ব্যগ্রভাবে বলল, এই কটা দিন আমাদের একটু অন্যভাবে থাকা কি সম্ভব হয় না?

অন্যভাবে মানে?—সত্যিই বুঝি বুঝতে পারছে না চন্দ্রাবলী।

মানে? মানে—ইচ্ছে হচ্ছে না যে, ও এসে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা দেখুক।

ও-হো-হো-হো-হো!—আবার হেসে উঠল চন্দ্রাবলী, বুঝলাম তোমার প্রেমপাত্রীর সামনে মান রাখতে এ কটা দিন অভিনয় করতে হবে আমাকে। কেমন? তাই না?

দীপঙ্কর শান্তভাবে বলল, সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?

অসম্ভব আর কী? 'অসম্ভব' বলে সংসারে সত্যিই কিছু আছে নাকি?

তা বটে। কিন্তু আমার প্রার্থনাটা খুব নির্লজ্জ হল না?

এমন আর কী?

কিন্তু কারণটা তো জানতে চাইলে না?

ওমা, এ তো জলের মতন সোজা, আবার জিজ্ঞেস করে জানতে হয় নাকি?

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল দীপঙ্কর। কী অদ্ভুত অন্যরকম দেখাচ্ছে চন্দ্রাবলীকে! হাসলে মানুষের চেহারা এত বদলে যায়?

নিজে থেকে এবার একটা কথা বলল চন্দ্রাবলী। বলল, বেচারা মেয়েটা তোমার বিরহে জীবনটাই বরবাদ দিল, আর তুমি দিব্যি—। কিন্তু ওকে বিয়ে না করবার হেতু?

কত অহেতুক জিনিসও সংসারে মস্ত একটা হেতু হয়ে দাঁড়ায়।—বলে আস্তে আস্তে চলে গেল দীপঙ্কর।

চন্দ্রাবলী স্টেশনে গেল।

হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা করল আরতিকে: ভাগ্যিস-বাই এখানে অফিসের কাজ পড়ল, তাই পায়ের ধুলো পড়ল মশাইয়ের। কদিনের মেয়াদ? মাত্র চার দিন? ওমা! তা চলবে না। ইচ্ছে করে খাতাপত্র জটিল করে ফেলে বলে পাঠাও, আরও সময় লাগবে।

আরতি বোধ করি এতটা আশা করে নি, কারণ বিয়ের সময় দেখেছিল চন্দ্রাবলীকে। ভাবল, যাক, দীপঙ্কর তা হলে সুখী হয়েছে।

ভেবে সুখী হল কি?

কে জানে! আরতিদের মত গম্ভীর আত্মস্থ মেয়েদের মনের কথা বোঝা যায় না।

চায়ের টেবিলে হাসির ঝড় তোলে চন্দ্রাবলী: ও মা, কী কাণ্ড! চা খাও না তুমি? কাজ কর কিসের জোরে? যাক, ভালই হল, আমি এক পেয়ালা বাড়তি খেয়ে নিই। কী দেব তা হলে, কফি? কী গো, তুমিও কি অতিথির সঙ্গে কফি খাবে নাকি? বল তো দিই তাই।

অভিনয়ের প্রস্তাবটা দীপঙ্করেরই, তবু ও যেন অপ্রতিভের একশেষ হয়ে পড়ছে। কিন্তু চন্দ্রাবলী একাই একশো। আরতির স্বাভাবিক গাম্ভীর্যও ওর হাসি-কৌতুকের ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

রান্নাঘরে বসে রামলাল বলে, ব্যাপার কী বল্ তো বংশী?

বোধ হয় কিছু খেয়েছে।—বংশী বিজ্ঞভাবে বলে।

ধ্যেত! কী বাজে বকিস?

বাজে নয় রে। আগে অন্য অন্য ঘরে আমি দেখেছি। পেটে 'কিছু' পড়লেই প্যাঁচামুখ লোকগুলো ফুর্তিবাজ হয়ে যায়।

কিন্তু বংশীর কথা বুঝি এক হিসেবে ঠিক।

চন্দ্রাবলী যেন কী এক নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। ও নিজে হাতে রেঁধে অতিথিকে খাওয়াবে, তাকে জোর করে টেনে নিয়ে বেড়াতে যাবে, গান গেয়ে শোনাবে, কবিতা আবৃত্তি করিয়ে শুনবে, আর মুহূর্তে মুহূর্তে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠবে দীপঙ্করের সঙ্গে ব্যবহারে।

এই দেখ! শুয়ে পড়লে মানে? বেড়াতে যাওয়া হবে না? ইস! আবদার কত! আলস্য করতে ইচ্ছে করছে! ও-সব চলবে না। ওঠ শিগগির।…ও কী, উনি বোঝাতে চান আমার রান্না একেবারে অখাদ্য। …আচ্ছা, তুমি রোজ কী বলে অফিস যাচ্ছ? অতিথির সম্মানার্থে একটা দিনও অন্তত ছুটি নেবে তো?

দীপঙ্কর যেন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে।

ভেবেছিল, নিজের বঞ্চিত জীবনের গ্লানিটা যাতে নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে না ওঠে আরতির চোখে, এটুকু অন্তত করুক চন্দ্রাবলী। আরতি যেন দীপঙ্করকে করুণা করবার সুযোগ না পায়। কিন্তু চন্দ্রাবলী যেন আর-এক যুদ্ধজয়ের খেলায় বিভোর।

যেখানে এক গণ্ডূষ জলে কাজ মিটত, সেখানে চন্দ্রাবলী বন্যা বয়াচ্ছে।

রাত্রে—প্রথম রাত্রেই নিজের ঘরে দুটো বিছানা করে ফেলে চন্দ্রাবলী আরতির হাত ধরে দীপঙ্করের ঘরের দরজায় উঁকি মেরে এক গাল হেসে বলেছিল, আমি আরতির সঙ্গেই শুচ্ছি, বুঝলে? সারারাত রাজ্যের আজেবাজে গল্প করে কাটাব।

আরতি অপ্রতিভ হয়ে বলল, আরে, সে কী? ছি-ছি! না।

চন্দ্রাবলী এ-আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে হেসে হেসে বলে, না কেন? ও তো চিরদিনের, তুমি হলে দুদিনের।

আরতি রাগ দেখিয়ে বলে, ওর সঙ্গে আমার তুলনা কিসের?

আচ্ছা বাপু, তুলনা না হয় নাই হল। অতুলনীয়ই উনি। কিন্তু দু-এক দিন ঘর বদল করতে ভাল লাগে। ভারি ইচ্ছে করে এক-একদিন এ-ঘরটায় শুতে। শুয়ে শুয়ে কেমন ওই ঝাউগাছের মাথা-নাড়া দেখা যায় এ-ঘর থেকে। তা একা তো শুতে পারি না। আর বাড়ির কর্তাটি লোহার সিন্দুক একা রেখে অন্যত্র শুতে রাজী নয়।

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে দীপঙ্কর। ওর মনে হয় বুঝি ঘুমের জগতে রয়েছে। এ কী অসম্ভব সম্ভব! আর স্তম্ভিত হয়ে থাকে বুঝি ঝাউগাছের ওই ঝিরঝিরে পাতাগুলো। যাদের প্রত্যেকখানির গায়েই বহু বিনিদ্র রাত্রির দীর্ঘশ্বাস লেখা আছে।

নিরালায় আরতিকেই পেতে চাইবে, এটাই হত দীপঙ্করের পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু পাশার ঘুঁটি কখন যে কোথায় গিয়ে পড়ে! চন্দ্রাবলীকেই নিরালায় আবিষ্কার করতে চায় দীপঙ্কর। যেন কোথাকার কোন একটা মরচে-পড়া তালা খুলে পড়েছে, আর সেই দরজা-খোলা ঘরের মধ্য থেকে ছড়িয়ে পড়েছে অগাধ ঐশ্বর্য। এ-তালার চাবি কোথায় ছিল?

কিন্তু চন্দ্রাবলীর রহস্য কে বুঝবে?

হয়তো দীপঙ্কর কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, চন্দ্রাবলী দিব্যি গলা খুলে বলে, এই দেখ কাণ্ড। এখনও তুমি চান করতে যাও নি? এর পর 'দেরি হয়ে গেল' বলে লাফাবে।

কোন এক সময় দীপঙ্কর কঠিন গলায় বলে, তোমার অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্যে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত।

চন্দ্রাবলী হাসে: শুধু ওই জন্যে? আরও কত কারণে পাওয়া উচিত।

কিন্তু কী তুমি বল তো?—গলা চড়িয়ে বলে উঠে, আরতি এল আর তুমি সেই রামলালের ওপর ভরসা করে বসে আছ? নিজে একটু বাজারে-টাজারে যাবে তো?

ওঘর থেকে শুনতে পেয়ে আরতি বলে ওঠে, দোহাই মিসেস দীপঙ্কর, তোমার যত্নের ঠেলা একটু কমাও।

চন্দ্রাবলী বলে, ইস, কমাব বই কি! এত সুসময় আমার আর কবে আসবে!

দীপঙ্কর খুব চাপা গলায় বলে, তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

কষ্ট! ওটা আমার অভিধানে নেই।

যাবার আগে আরতি বলল নিভৃতে, খুব খুশী হলাম দীপঙ্কর, তোমার ঘর আর ঘরণী দেখে। সত্যি বলতে, একটু ভাবনাই ছিল।

এমনও তো হতে পারে ভাবনার কারণটা ঠিকই আছে, এর সবটাই ফাঁকি।

না, তা হতে পারে না। মেয়েমানুষের চোখ ভুল দেখে না।

কিন্তু মেয়েমানুষ কথাটা সব সময় ভুলিয়ে ভুলিয়ে ভুল বলে, তাই নয় কি?

সব সময় নয় দীপঙ্কর। তুমি আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী। তুমি সুখে আছ স্বচ্ছন্দে আছ, এটা ভাবতে ভাল লাগবে।

স্টেশনে তুলে দিতে এল ওরা দুজনেই।

আরতিকে আবার আসবার জন্যে অশেষ অনুরোধ জানাল চন্দ্রাবলী।

ফেরার সময় এক মোটরে দুজনে চুপ।

যেন সমুদ্রে হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির কাছাকাছি এসে এক সময় দীপঙ্কর বলে উঠল, খুব ঠকানো গেল আরতিকে, কী বল?

হ্যাঁ, খুব।—বলল চন্দ্রাবলী।

আরতি বলে গেল 'তোমাদের দেখে খুশী হলাম।' বলল, 'মেয়েমানুষের চোখ ভুল দেখে না।'

কথাটা খুব ঠিক বলেছেন।

সহসা ওর মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে দীপঙ্কর বলে ওঠে, আচ্ছা, যদি এমন হত ওর ধারণাটাই নির্ভুল!

হতে কি না পারে?

ধর, তাই হল। ধর, ও যা ভেবে গেল তাই সত্যি।

কোন সময় হয়তো তাও অসম্ভব হবে না।

মুখটা ফিরিয়ে নিতে চায় চন্দ্রাবলী, নইলে বুঝি এতদিনের সঞ্চিত মর্যাদা ভূমিসাৎ হয়ে যায়। কিন্তু নিতে দেয় না দীপঙ্কর, তেমনি ধরে থেকে ব্যগ্রভাবে বলে বসে, তবে এখনই বা হতে পারে না কেন চন্দ্রা?

চন্দ্রাবলী প্রায় জোর করেই মুখ নামাল।

কী অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল এই কটা দিন! জীবনের এই স্বাদ থেকে আমরা ইচ্ছে করে কেন বঞ্চিত আছি, বলতে পার চন্দ্রা?

চন্দ্রাবলী আস্তে আস্তে বলে, হয়তো আমারই ভুলে। যাকে শ্রদ্ধা করা উচিত ছিল, তাকে ঈর্ষা করেছি।

ভাঙল বুঝি কাচের দেওয়াল!

কে জানে কখন চিড় ধরেছিল, তিলে তিলে দীর্ঘকাল ধরে, না সাময়িক ঘূর্ণি ঝড়ের ধাক্কায়?

গভীর স্বরে বলল দীপঙ্কর, না চন্দ্রা, আমাকে দোষ স্বীকার করতে দাও। আমিও তো কোনদিন বুঝতে চাই নি তোমায়, বোঝাতে চাই নি নিজেকে।

মোটরের পথ শেষ হল।

যে ঘরে দুটি মেয়ে এই কটা দিন কাটিয়ে গিয়েছে সে ঘরে এসে বসল ওরা। ঝাউপাতা কাঁপছে ঝিরঝির।

কিন্তু আরতি?—বলল চন্দ্রাবলী।

আরতি! সে জীবনের অন্য ক্ষেত্র বেছে নিয়েছে চন্দ্রা। সেখানে সে সম্পূর্ণ।

মোটরের পথ সহজেই শেষ হল, কিন্তু রেলগাড়ির পথটা দীর্ঘ, সহজে শেষ হবে না। 'জীবনের অন্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ' মেয়েটা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে থাকে, মানুষ কত ভুল ধারণা নিয়েই কাটায়। এতদিন যেটাকে সে পাথরের প্রাচীর ভেবে এসেছে, সেটা কাচের দেওয়াল মাত্র।

॥ চলমান জগৎ ॥

ছোকরা মারাই গেল।

রায়চৌধুরীদের ওই ছোকরা চাকরটা। রাধাপদ না কী যেন নাম!

ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। নির্জলা সত্যি। না, কারও মারা যাওয়াটা কিছু অবিশ্বাস্য ব্যাপার নয়, অবিশ্বাস্য হচ্ছে ওর মারা যাওয়ার পদ্ধতিটা। এ-যুগে এমনটা বড় দেখা যায় না।

আরও আশ্চর্যি, ছেলেটার পেটে পিলেও ছিল না। আর রায়চৌধুরীর সেজ ছেলের পায়ে বুটও ছিল না। তবু পট্কা ছোঁড়া পট করে মরেই গেল।

কিন্তু সেজবাবুর বা দোষ কী? এ-রকম ক্ষেত্রে কোন্ বাড়ির বাবুই বা মেজাজ ঠিক রাখতে পারত, আর ওরকম একটা ভূত চাকরকে দু ঘা কষিয়ে না দিয়ে থাকত? হতভাগা ভূতটা যদি শুধু সেজবাবুকে ফাঁসাবার জন্যেই স্রেফ মারা গিয়ে থাকে, কী করবার আছে সেজবাবুর? তবু রায়চৌধুরীরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। ডাক্তারও ডেকেছিলেন, জল বাতাস বরফ ওষুধ সবই করেছিলেন।

বাঁচল না। পরমায়ু ফুরলে আটকায় কে?

অবিশ্যি এসবের কিছুই হত না, যদি না সেদিন সেজবাবুর নতুন ভায়রা-ভাই সস্ত্রীক বেড়াতে আসতেন, আর যদি না সেজবাবু রাধাপদকে কড়াপাকের সন্দেশ আর ফুলকপির সিঙাড়া আনতে পাঠাতেন।

কিন্তু ভবিতব্যকে রোখে কে?

রাধাপদর নিয়তি, খাবার আনতে গেল তো গেলই। এদিকে সেজ-বউদির চা-দানিতে চা প্রথমে কড়া ও পরে শীতল হয়ে উঠল, আর সেজবউদি নিজে প্রথমে চঞ্চল, তৎপরে অধীর আর শেষ অবধি আগুন হয়ে উঠলেন।

তবু দেখা নেই রাধাপদর।

কতক্ষণ আর 'ধাই-ধাই' কুটুম্বকে ফাঁকা গল্প করে করে আটকে রাখা

যায়? রাখা গেলও না শেষ অবধি। তাঁরা রাত হয়ে যাওয়ার ছুতোয় অস্থিরতা প্রকাশ করে বিদায় নিলেন। বিদায় নিতেই সেজবউদি তারস্বরে ঘোষণা করলেন, রাধাপদকে বিদায় না করে জলগ্রহণ করবেন না তিনি। আর সেজবাবু? তিনি ওদের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও যখন ক্ষিপ্ত-মূর্তিতে শুধু গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, রাধাপদ এলে একবার 'দেখে নেবেন' বলে, তখনই হতভাগ্য রাধাপদ সন্দেশ আর সিঙাড়া নিয়ে এসে দর্শন দিল।

বোমা ফাটল।

প্রচণ্ড চিৎকারে দেরির কৈফিয়ত চাইলেন সেজবাবু।

কিন্তু না, কৈফিয়ত আর সেদিন দেওয়া হয় নি রাধাপদর, অবকাশ পায় নি বেচারা।

ও এসে দাঁড়ানোর মুহূর্তেই একটা প্রবল হুঙ্কার উঠল, আর পরক্ষণেই রায়চৌধুরীদের গেটের সামনে শুধুমাত্র 'অ্যাঁক' করে একটা শব্দর সঙ্গে সঙ্গেই গড়িয়ে পড়ল সন্দেশ, সিঙাড়া আর রাধাপদ।

কথাটা এমন কিছু পাঁচজনে টের পাবার কথা নয়।

রায়চৌধুরীদের উঠনে যদি কীর্তনের আসর বসত, হয়তো খবর দিয়ে না জানালে পাড়ার লোক টের পেত না। কিন্তু এ আলাদা ব্যাপার!

গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাটি ফুঁড়ে ভিড় উঠল। হ্যাঁ, 'ভিড় জমল' না বলে ভিড় উঠল বলাই ঠিক। গেটের ঠিক বাইরেই একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল।

সেজবাবু প্রমাদ গনে ডাক্তার ডাকলেন, ওষুধ দিলেন, জল বাতাস বরফের জন্যে হাঁকাহাঁকি করলেন, আর শেষ অবধি ঘরে গিয়ে পাখার স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

ওদিকে স্বয়ং রায়চৌধুরী-কর্তা নিভৃতে ডাক্তারকে নিয়ে পড়লেন।

অবিশ্যি দরকার খুব ছিল না। ডাক্তার সেজকর্তার বন্ধু। অতএব 'স্বাভাবিক মৃত্যু'র মড়া রাধাপদ স্থানীয় সৎকার-সমিতির সদস্যদের কাঁধে চড়ে চলে গেল শ্মশানে।

আশপাশের আর সামনের যত বাড়ির বারান্দা ছিল, সেখানে ছবির মিছিলের মত একটা 'স্তব্ধ জনতা' নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

এই তো ব্যাপার!

'যা হবার হয়ে গেছে' বলে মনকে সান্ত্বনা দেওয়াও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গোল বাধল পরদিন সকালে। কোথা থেকে পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্ত বেশবাসে ছুটে এল রাধাপদর বাবা নিতাইপদ। নিতাইপদ গেটের সামনে মাথা খুঁড়ে, চুল ছিঁড়ে, বুক চাপড়ে এমন একটা ভয়ঙ্কর সোরগোল তুলে কাঁদতে শুরু করল যে, তখনও পাড়ার আর কোন বাড়ির বারান্দা ফাঁকা রইল না। বুঝতেও বাকী রইল না কারও কিছু।

বুঝবে না কেন ? পাড়াটা হচ্ছে যে একেবারে সভাভব্য শিক্ষিত লোকের পাড়া। তা ছাড়া, দু সারি বাড়ির মাঝখানের রাস্তাটা মাত্র বিশ ফুট চওড়া। রাস্তা সরু হক, পাড়াটি ছবির মত সুন্দর শৌখিন। প্রায় সব বাড়িই গোল বারান্দা, লোহার গেট, গ্যারেজ আর মোজেক-মেঝে-শোভিত। নতুন পাড়া। বলতে গেলে অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্মচারীদের বার্ধক্যের বারাণসী। শুধু রায়চৌধুরীরাই নাকি প্রাক্তন জমিদার। নইলে সামনের উনি প্রাক্তন জজ, তার পাশের উনি প্রাক্তন আই জি, এ-পাশের ইনি শেষতক কিছুকাল এস ডি ও হয়েছিলেন, আর ও-ধারের উনি প্রাক্তন হয়ে যান নি, এখনও হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন।

ওঁরা, ওঁদের মেয়ে-ছেলে-বউরা সব কিছু দেখলেন গোল-বারান্দায় বুক ঝুঁকিয়ে ঝুঁকিয়ে। গতকালও দেখেছিলেন।· চাপা একটা সন্দেহে গুলতানিও করেছিলেন সবাই, আজ সবটাই স্পষ্ট হল। সারা পাড়ায় একটা ধিক্কার ছি-ছি-কারের চাপা ঝড় বইতে লাগল।

ওদিকে রাধাপদর বাবা বুক চাপড়ে চাপড়ে বুকে কালশিরে পড়াতে লাগল।

কথায় বলে 'অনাথের ভগবানই সহায়'।

কিন্তু অনাথের ভগবান বোধ করি অনাথের বেশেই আসেন। পাড়ায় বস্তি নেই, তবু কোথা থেকে কতকগুলো বস্তির ছেলেছোকরা এসে জুটে গেল রাধাপদর বাবা নিতাইপদর আশেপাশে। নিতাইপদকে চাঙ্গা করে তুলল ওরা 'রক্তের বদলে রক্ত চাই'-মন্ত্রে। বলল, কেস্ করুক নিতাইপদ, ওরা লড়বে। গরিব বলে এত বড় নৃশংস অরাজকতা সইবে নিতাইপদ ?

কখনই না।

যে ছেলেটি ওরই মধ্যে একটু লেখাপড়া জানা, সে একখানা ফুলস্ক্যাপ

কাগজে শুদ্ধ বানানে একটি অভিযোগপত্রও লিখে ফেলল। কাগজে ছাপাবে।

এখন বাকী শুধু পাড়ার মাতব্বরদের স্বাক্ষর নেওয়া।

সবাই দেখেছে।—বলল মদন নন্দী।

তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে।—বলল রজনী পাল নিতাইপদকে। নিতাইপদও প্রতিহিংসায় বুক বেঁধে উঠল।

ফাঁসিকাঠে লটকাব ওকে।—বলল সত্যচরণ।

ফাঁসি যদি-বা না হয়, যাবজ্জীবন জেল।—বলে মানিকলাল, বড়লোক বলে পার পাবে ভেবেছে?

ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখুক বাছাধন। শালার বাবুদের জ্যান্ত কবর দিলে রাগ যায় না।—বলল সুধীর, রামলাল আর নয়নচাঁদ: একবার বাবুদের সইগুলো হাতে আসুক, দেখিয়ে দিচ্ছি মজা।

উন্মত্ত শোকে বিপর্যস্তমূর্তি নিতাইপদ ফ্যালফ্যাল করে তাকাতে তাকাতে চলল ওদের সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় স্বাক্ষর?

পাগল না কি! এইসব গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর কি মাঠের দুর্বোঘাস যে, ছিঁড়ে আনলেই হল? ওঁরা বললেন, ওঁরা তো কেউ-ই তেমন 'প্রত্যক্ষ' দেখেন নি, আর আইনজ্ঞ লোক ওঁরা, প্রত্যক্ষ না-দেখে কখনও খপ করে একটা সই বসিয়ে দিতে পারেন?

প্রাক্তন জজ বললেন, আমি বাপু তখন বাড়িই ছিলাম না। ফিরে শুনলাম বটে, কী একটা স্যাড ব্যাপার হয়ে গেছে। কিন্তু যাই বল বাপু, স্পষ্ট চোখে না দেখলে কী করে—

একই কথা বললেন সবাই।

স্পষ্ট চোখে না দেখে অভিযোগপত্রে স্বাক্ষর দেওয়া সম্ভব নয়।

রোখা ছেলে মানিকলাল প্রাক্তন এস ডি ওকে বলল, জানেন আপনি, রাধাপদ ছিল এই নিতাইপদর একমাত্র ছেলে। ধারণা করতে পারেন আজ কী অবস্থা এর?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল নিতাইপদ।

বাবু, বুকের হাড় ভেঙে গেল আমার, চোখের দৃষ্টি ঘুচে গেল। 'পদ'

আমার পেটের ভাত, পরনের কানি। আমার সেই জলজ্যান্ত ছেলেটাকে জুতোর ঠোক্কর মেরে মেরে ফেলল বাবু। জগতে কি ধর্ম নেই? আইন নেই? আপনারা এর প্রিতিকার করবেন না?

বিব্রত প্রাক্তন এস ডি ও বললেন, দেখ, আমি একা কী করতে পারি? বরং কিছু সাহায্য-টাহায্য—

সাহায্য? টাকার সাহায্য? ভিক্ষে?—মানিকলাল রক্তচক্ষে বক্তৃতা শুরু করে দেয়, গরিবকে আপনারা বুঝি এই রকমই ভাবেন বাবু? দুটো টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চান? গরিবের প্রাণ খোলামকুচি? জানেন, আজ রাধাপদর তৃষিত আত্মা কী চাইছে? চাইছে রক্তের বদলে রক্ত। ওই পাষণ্ড চৌধুরী বাবুদের উচিত শাস্তি না হলে সে আত্মা শান্ত হবে না।

এস ডি ও প্রায়-হাসির মত করে বললেন, না হলে আমি আর কী করতে পারি!

আপনারা চোখে দেখে ঝঞ্ঝাটের ভয়ে সাক্ষী দেবেন না? আপনারা না বিদ্বান শিক্ষিত—

এবার এস ডি ও ভুরু কোঁচকালেন। তারপর বললেন, আমার বাড়ির সামনে গোলমাল কোর না। বলেছি তো এসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই। পাঁচ-দশটা টাকা বরং দিতে পারি, পাড়া থেকে কিছু চাঁদা তুলেও—

নিতাইপদ একটু আগে অনেক বড় বড় কথা শুনেছে, তা ছাড়া মনটা খারাপ, তাই বলে উঠল, বাবু আপনার ঘরেও তো ছেলেপিলে আছে, কী করে টাকার কথা বললেন? টাকায় পুত্রশোক নিবারণ হবে?

এস ডি ও বললেন, সে তো সত্যি, তবে থাক্।

উকিলবাবু বললেন, ওসব নালিশ-ফালিশের মধ্যে গিয়ে কী হবে বাপু? বরং এই সময় রায়চৌধুরীদের মোচড় দিয়ে কিছু টাকা আদায় করে নিতে পারতে।

নিতাই আর-একবার হাউমাউ করে কাঁদল, আমি টাকা চাই না, নেয্য বিচার চাই।

উকিল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, নিতাইপদর পৃষ্ঠপোষকবর্গ বলতে দিল না। তারা নিতাইকে হ্যাঁচকা মেরে টেনে নিয়ে দলের মধ্যমণি করে বেরিয়ে পড়ল স্লোগান দিতে দিতে।

'জুলুমবাজি চলবে না।' 'খুন করে কেউ পার পাবে না।' 'আমরা লড়ব, মারব, ভাঙব।' 'ন্যায় বিচার চাই—ন্যায় বিচার।'

বাতাসে বাতাসে শ্লোগানের প্রতিধ্বনি উঠল, নিতাইপদ মন্ত্রাহতের মত চলল ওদের সঙ্গে।

ছেলেগুলিকে ওর দেবদূত বলে মনে লাগছিল, আর এমনও মনে হচ্ছিল, রাধাপদকে বুঝি পাইয়েই দেবে ওরা। ওদের সকলের মুখগুলোও যেন রাধাপদর মত।

আহা, রাধাপদকে বুঝি কোনদিন ভাল করে তাকিয়ে দেখেও নি নিতাইপদ, একদিন দুটো ভালমন্দ খেতেও বলে নি।

প্রাণের মধ্যে হাহাকার করতে থাকে। আর-একটিবারের জন্যেও যদি ফিরে পেত নিতাইকে!

সারাটা বেলা রোদে টহল দিয়ে সাতপাড়া ঘুরে ঘুরে কাহিল হয়ে ঢুকল ওরা চায়ের দোকানে। নিতাইপদর জন্যেও এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছিল, নিতাই হাউমাউ করে কেঁদে বলল, গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি বাবু। সে তো আমার ছেলে ছেল না, বাপ ছেল। আমিই তার ছেলের কোর্তব্য করি।

ওরা একজন ডবল কাপ খেয়ে নিল।

রাধাপদর মৃত্যুকাহিনীটা যদি বানানো গল্প হত, তাহলে হয়তো গুছিয়ে ভালমত একটা পরিণতি খাড়া করা যেত। কিন্তু বানানো নয়, নির্জলা সত্যি। তাই কোন সূত্র ধরেই অন্তত ঈশ্বরের সুবিচার দেখিয়েও রায়চৌধুরীর সেজ ছেলের কিছু করা গেল না।

নিতাইপদর সুহৃদরা প্রথমটা চা আর ফুচকা খেতে খেতে পরামর্শ ভাঁজতে লাগল কী করে 'ব্যাটা বড়লোক'কে শাস্তি দেওয়া যায়, তারপর কেমন যেন প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল। একজন হঠাৎ প্রস্তাব করল, দূর মাইরি, সারাদিন টো-টো কোম্পানি করে মেজাজটা বিগড়ে গেছে। চল্, মধুবালার নতুন ছবিটা দেখে আসি।

সমস্বরে সমর্থন উঠল, ঠিক হ্যায়, জীতা রহো।

বাস্, যে কথা সেই কাজ।

আর দেরি করলে টিকিট পাওয়ার আশা দুরাশা। এই বেলা 'নাইন' দিতে যেতে হবে।

নিতাইপদ মুছে গেল ওদের পটভূমিকা থেকে। না-যাওয়াই আশ্চর্য। কোথায় মধুবালা আর কোথায় নিতাইপদ!

নিতাইপদ কদিন ধরে কেঁদে বেড়াল, কিন্তু তার উৎসাহদাতাদের টিকিটিও দেখতে পেল না। গ্যাঙকে গ্যাঙ হাওয়া। কেউ বলল, সেজবাবু নাকি ওদের ধরে আচ্ছা করে শাসিয়ে দিয়েছেন। কেউ বলল, সম্পূর্ণ উল্টো, সেজ-বাবু ওদের 'ফিস্টি' খাবার টাকা দিয়েছেন। ঈশ্বর জানেন, কী সত্যি কী মিথ্যে।

নিতাই শেষ পর্যন্ত একদিন পুত্রশোকের জ্বালার চাইতেও তীব্রতর জ্বালায় কাতর হয়ে বাবুদের বাড়ি বাড়ি ধন্না দিতে এল তাঁদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দিতে। কিন্তু দ্রুত ধাবমান পৃথিবীতে পূর্বকথা মনে রাখবার অবকাশ কার কতটুকু?

পাঁচ দশ টাকার সাহায্যের কথা দূরে থাক্, নিতাইপদ নামটাই মনে পড়ল না কারও, চেনা করাতে হল রাধাপদর পরিচয় দিয়ে দিয়ে। কিন্তু 'রাধাপদ'র নামটাও যেন আর এখন কারও সহ্য হল না। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি এক-আধটা সিকি আধুলি ফেলে দিয়ে ভারী মুখে বললেন, এর বেশী আর পারব না, অন্য বাড়ি দেখ। কেউ কেউ বেজারমুখে মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, এখন শেষ মাসে সাহায্য করব কোথা থেকে?

নিতাইপদ?

নিতাইপদ একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে সিকি-দুয়ানিগুলো গুনতে গুনতে ভাবল, কী ভুলই হয়েছে সেদিন! রায়চৌধুরীদের ওখানে গিয়ে মোচড় দিতে পারলে, কতটাই না জানি আদায় হত! যতই হোক, ওরা বড়লোক, ওদের হাত ঝাড়লে পর্বত।

॥ হার ॥

আগে নাম ছিল 'গণেশভবন', বদলে যুগের সঙ্গে তাল রেখে নামকরণ হয়েছে 'গণভবন'। এর চাইতে কুৎসিত আর এর চাইতে দামী বাড়ি এ অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নেই। কেউ যদি বলে বাড়িটা বানাতে বিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে, স্বীকার করতে হবে কিছু বাড়িয়ে বলে নি। বাড়ি তো নয়—একটা পাড়া, আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ওর গঠনকর্তার রুচিহীনতার ছাপ। তবু বহু রুচিমান ব্যক্তিরই দেখা মিলবে এর মধ্যে সন্দেহ নেই। এর বিরাট গহ্বরের সঙ্কীর্ণ কোটরে কোটরে পোকার মত ঠেসাঠেসি ঘেঁষাঘেঁষি বাস করছে অগণিত মানুষ। প্রয়োজনের তাগিদে সবাই এসে বাসা বেঁধেছে একই ছাতের নীচে।

হয়তো দেয়ালের এপিঠে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন তরুণ মেধাবী ছাত্র রাত জেগে পাঠচর্চা করে, তখন দেয়ালের ওপিঠে কোন বেহেড মাতালের জড়িত কণ্ঠের আদিরসাশ্রিত সঙ্গীত শোনা যায়। হয়তো এঘরে যখন ফুল-শয্যার শয্যা বিছানো হচ্ছে, ওঘরে তখন চলছে কারও শেষ শয্যার আয়োজন।

কিন্তু কারও কিছু এসে-যায় না তাতে, কেউ কাউকে কিছু বলে না, কেউ কারও প্রতি দোষারোপ করে না। সকলেই জানে এই দুনিয়া।

এরই একটা কোটরে থাকে শঙ্কর।

কী একটা ঔষধ কোম্পানিতে কাজ করে, একা থাকে বাইরে খায়। শখের মধ্যে ভাঙা যন্ত্র সারানো—হয় রেডিও, নয় হারমোনিয়ম। নয়তো ঘড়ি কি ফাউণ্টেন, নয়তো বা একটা টাইপরাইটিং মেশিনই, আছেই ওর ঘরে মজুত আধখোলা নড়বড়ে দেহ নিয়ে।

সামনের ঘরের বিনয়বাবু মাঝে মাঝে বলেন, সব জিনিস মেরামত করবার বিদ্যেই শিখে রেখেছেন নাকি মশাই?

শঙ্কর হাসে, বিদ্যেটা তো ওই মেরামতিই, বস্তুটা যাই হোক।

তবু এক এক জিনিসের এক এক কায়দা। শিখতে তো হয়েছে?

ক্ষেপেছেন ?—শঙ্কর হেসে ওঠে, শিখলাম আবার কবে ? আসল কথা না-পড়ে পণ্ডিতই হচ্ছে পণ্ডিতের সেরা, আর না-শিখে ওস্তাদই ওস্তাদের রাজা, বুঝলেন ?

বিনয়বাবু অবশ্য বোঝেন। তাই মাঝে মাঝে বিকল ঘড়িটা ফাউন্টেনটা সারিয়ে নেন বিনি পয়সায়। মাঝে মাঝে এখান ওখান থেকে নিয়েও আসেন টুটাফুটা মাল কিছু কিছু।

শঙ্করের তাতে ব্যাজার নেই।

এমনি একদিন বেশী রাত্রে নিবিষ্ট ভঙ্গীতে মন দিয়ে একটা টাইমপীসের পার্টস খুলে খুলে সাবধানে টেবিলে রাখছে, হঠাৎ টেবিলের সামনে একটা ছায়া পড়ল।

চমকে উঠল শঙ্কর, এত রাত্রে আবার বিনয়বাবু কেন ? কারণ, একমাত্র বিনয়বাবুই ওর ঘরে আসেন। কিন্তু এ কী ? এ আবার কে ? থতমত খেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, কথা বলতে পারল না।

কথা কইল মেয়েটিই। খুব আস্তে খুব নম্র গলায় বলল, আমাকে কয়েকটা কথা বলবার অনুমতি দেবেন ?

ঘড়িতে রাত সওয়া দশটা।

শঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠে ওকে দেখে নিয়ে এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়েছে, তাই বলল, একটা কেন, অজস্র কথা বলতে পারেন, যদি দরকার থাকে আপনার। কিন্তু সময়টা নির্বাচন করে আসবেন। আজকের নির্বাচন ভাল হয় নি।

বলতে বলতে প্রায় অজ্ঞাতসারেই নিজেই সে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

মেয়েটি কিন্তু বিচলিত হল না, বলল, এ ছাড়া অন্য সময় যদি সম্ভব হত, এমন অদ্ভুত নির্বাচন করতাম না। বিশ্বাস করুন, এখন ছাড়া আর উপায় নেই। আমি আপনার কাছে একটু সাহায্যভিক্ষা করতে এসেছি।

শঙ্কর গম্ভীরভাবে বলল, এ বাড়িতে তো আরও অনেক লোক আছে, বেছে বেছে আমাকেই বা সাহায্যের উপযুক্ত বিবেচনা করলেন কেন ?

কী জানি ?—মেয়েটি অসহায়ভাবে বলে, কাউকেই তো বুঝতে পারি না এ বাড়িতে। এই দু মাস এসেছি, এখনও নিজের রুম নম্বর খুঁজে বার করতেই অস্থির হয়ে যাই। কারুকেই দেখে চিনতে পারি নে। শুধু আপনাকেই—

শঙ্কর বেশ কৌতুক অনুভব করে বলে, শুধু আমাকেই কী ?

মেয়েটি ছলছল চোখ তুলে বলে, আপনাকেই চিনতে পারি, আপনি অনেক সময় ঘরে বসে থাকেন তাই বোধ হয়—

অ! কিন্তু সকালেও আমি ঘরে বসে থাকব, আপনি অনুগ্রহ করে তখনই আসবেন। এখন নমস্কার।

আপনি অত ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে কি অবিশ্বাস করছেন?—স্পষ্ট চোখে তাকাল মেয়েটি।

এর পর আর পুরুষের পক্ষে অন্তত বিব্রত হওয়া চলে না। তাই গম্ভীর হয়েই বলে শঙ্কর, অবিশ্বাসের কথা নয়, কথা হচ্ছে শোভন-অশোভনের।

আমার সবটাই তো অশোভন।—মেয়েটি ম্রিয়মানভাবে বলে, নইলে আপনাকে চিনি না কিছু না, এসেছি আপনার ঘাড়ে কাজ চাপাতে!

মেয়েটি টেবিলের ওপর একটা হাত রাখল, আর মুহূর্তের মধ্যে একটা কাণ্ড করে বসল শঙ্কর। লাফিয়ে এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরে টেবিল থেকে তুলে, পুরো মানুষটাকেই টেনে খানিক সরিয়ে এনে গর্জন করে উঠল, কী, হচ্ছে কী! সব যে গেল! যদিও টেবিলের উপরিস্থিত সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলি অনড় অচলই ছিল।

মেয়েটি একটু হেসে ফেলে বলে, আমার হাতটাও যে গেল!

শঙ্কর লজ্জিতভাবে বলে, তা আপনি আচমকা এমন ভয় পাইয়ে দিলেন। এতটুকু একটু অংশ হারিয়ে গেলে কী ক্ষতি হবে জানেন না তো! থাক্‌গে, আপনি যখন নড়বেনই না, বলে ফেলুন চটপট কী আপনার দরকার?

মেয়েটি শান্তভাবে বলে, আপনি আমার একটা জিনিস বিক্রি করে দেবেন?

বিক্রি করে? জিনিস বিক্রি করে দেব? তার মানে? কী জিনিস?

মানে এই—মেয়েটি হাতের মুঠো খুলে একটা মোটা ভারী সোনার গোছাহার টেবিলের এক পাশে সাবধানে রাখল: এইটা দয়া করে বিক্রি করে দিন আমায়।

রাগে আপাদমস্তক জ্বলে গেল শঙ্করের।

ওঃ, ফাঁদপাতার কোন ছল!

আর তা নইলে রাতদুপুরেই বা কেন? রাগ প্রকাশ করতে দ্বিধা করল না, বিরক্তভাবে বলল, দেখুন, আপনার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি, দয়া

করে যদি আপনার ওসব মালপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে না যান, নিজেই বিপদে পড়বেন।

আশ্চর্য মেয়েটা! অবিচল দাঁড়িয়ে রইল। বলল, শঙ্করবাবু, আপনি অবশ্যই শিক্ষিত, বলুন তো খুব বিপদে না পড়লে কি কোন মেয়ে এমন ব্যবহার করে? মতলব আছে বই কি। যদি সভ্য ভাষায় 'সংকল্প' না বলেন? আমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন এই শেষ পারিবারিক সম্বলটুকুর বিনিময়ে আমার মৃত্যুপথযাত্রী দাদার চিকিৎসা করাবার মতলব আছে আমার শঙ্করবাবু।

শঙ্কর থতমত খেয়ে বলে, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

প্রয়োজনে পড়ে। এই বিরাট দৈত্য বাড়িটায় শুধু আপনাকেই যেন—। চুপ করল মেয়েটি।

শঙ্করও অবিচলিত।—এই বিবাট বাড়িটার অসংখ্য সদস্যর মধ্যে শুধু আমাকেই আপনার বিশ্বাসভাজন মনে হল কেন, এ একটা দুর্বোধ্য রহস্য! এই যে জিনিসটা এটা যদি সত্যি সোনার হয়, তা' হলে অবশ্যই এর অনেক দাম।

যদি সত্যি সোনার হয়!—আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল মেয়েটা, কেমন একটা ফ্যালফেলে চোখে। তারপর ব্যাকুলভাবে বলল, সোনা নয় সন্দেহ করছেন আপনি?

সন্দেহ না-হবারও কোন কারণ নেই। নেহাত ছেলেমানুষ নন আপনি, পরিস্থিতিটা ভাবুন। আমি আপনাকে চিনি না, আপনি আমাকে চেনেন না, হঠাৎ আপনি রাতদুপুরে একটা সোনার হার নিয়ে এসে অনুরোধ করছেন 'এটা বিক্রি করে দিন।' এটা কী রকম? খুব বাজে লেখকের কোন গল্পেও পড়েছেন কখনও এমন ঘটনা?

দাদার অসুখে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। চেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটা। তারপর তেমনিভাবেই বলল, ডাক্তারে বলেছে বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে, এই অন্ধপুরীতে থাকলে মারা যাবে দাদা, অথচ কোথাও টাকা নেই। তাই জন্যেই মার এই চিহ্নটা—দাদা মারা গেলে আমি কী করব শঙ্করবাবু?

শঙ্কর একটু কঠিন স্বরে বলে, সেটা খুবই ভয়ঙ্কর কথা। কিন্তু দেখুন,

এসব উচ্ছ্বাসপ্রবণতা আমার ভাল লাগে না। তেমন অবস্থা আপনার হয়ে থাকে, নিজেই যে কোন জুয়েলারের দোকানে গিয়ে বেচে আসতে পারেন।

হায় কপাল! দাদা টের পেলে কি তা করতে দেবে? না হলে এত রাত্রে কোনও মেয়ে পারে, এ ভাবে কারও ঘরে ঢুকে জ্বালাতন করতে? দাদা এখন ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে তাই। মা গিয়ে পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যে একতিল স্বস্তি নেই ওর। একদণ্ড চোখছাড়া হলেই অসংখ্য জেরা আর নানা সন্দেহ। কী ভাবে যে আছি আমি!

ঘড়ি যে এগারোটার কাঁটা ছাড়াল, এটা কি আর এখন খেয়াল নেই শঙ্করের? তাই নিজেও একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলে, বেশ, বুঝলাম আপনি খুব দুরবস্থায় আছেন, বুঝলাম আপনার টাকার খুব দরকার, বুঝলাম আপনার জিনিসটা আসল পাকা সোনার, কিন্তু আমাকে কেন? সেটা তো কিছুতেই বুঝছি না। ধরুন, এটা নিয়ে আমি মেরে দিলাম—

অ্যাঃ!—জলভরা চোখেও হেসে ওঠে মেয়েটা।

এতে এত অসম্ভবের কী আছে? এখানে কোন সাক্ষী নেই সাবুদ নেই, আপনার বোকামির ফল আপনি ভুগবেন, এতে আমার অপরাধও নেই—

আপনি ভয় দেখালেও আমি ভয় পাব না।

আচ্ছা মুশকিল বটে! লোকে রাত-বিরেতে ভূত-পেত্নীর পাল্লায় পড়ে শুনেছি। এ তো তার চেয়ে তফাত দেখছি না। আপনাকে এভাবে আমার ঘরে দেখলে লোকে কী বলবে, সে খেয়ালও কি নেই আপনার?

খেয়াল আছে বইকি! তাই জন্যেই তো তাড়াতাড়ি যেতে চাই।—উঠে দাঁড়াল মেয়েটি: মার মুখে শুনেছি বারো-তেরো ভরি সোনা আছে এটাতে, হাজার খানেক টাকা পাওয়া যাবে বোধ হয়। যাবে না?—আকুলতা ফুটে ওঠে ওর মুখে চোখে দেহের সমস্ত ভঙ্গীতে: তা হলেই দাদাকে নিয়ে আমি রাঁচি কি পুরী কোথাও—

আমি আবারও অনুরোধ করছি এটা আপনি এখন নিয়ে যান। কথা দিচ্ছি, কাল সকালেই আমি আপনার টাকার ব্যবস্থা করে দেব।

নিরুপায় হয়েই এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতিটা দিয়ে বসে শঙ্কর। মনে ভাবে, আজ এখন তো রেহাই পাই। কিন্তু কী এই ব্যাপারটা? মেয়েটা যা বলছে, সব সত্যি হওয়া সম্ভব? না, এ এক রকমের জুয়াচুরির কৌশল? তাই হবে। নির্ঘাত সোনাই নয় ওটা। এ-রকম ঢের শোনা যায়।

অথচ এই নির্বোধ সুন্দর চাহনি? এই সরল অকপট মুখ?

এও তো তা হলে মিথ্যা।

চলে যাচ্ছেন যে? নিয়ে যান এটা।—ফের বলে শঙ্কর, প্রায় ধমকের মত সুরে।

মেয়েটা ততক্ষণে দরজার কাছে এসেছে: আপনার কাছেই রাখুন, দোহাই আপনার। দাদার বালিশের তলায় চাবি, কত কষ্টে যে বার করেছি! আপনার পায়ে পড়ছি বিশ্বাস করুন আমায়।

কী আপদ, এ যে সত্যিই চলে যায়!

অথচ টেবিলের কোণে সোনাব্যাঙের মত পড়ে আছে সোনার ওই হারটা, নাকি বারো-তেরো ভরি ওজন নিয়ে।

মহা ঝামেলা করলেন তো আপনি! কী অসুখ আপনার দাদার?

মেয়েটা চোখ তুলে তাকাল একবার।

হরিণীর মত কালো চোখ। তার পরে নামিয়ে নিয়ে গভীর স্বরে বলল, যে রোগে আশা নেই, তবু আশা মরেও মরে না।

গম্ভীর হয়ে গেল শঙ্কর, কালো হয়ে উঠল ওর মুখ। বলল, অথচ এই ভাবে আছেন আপনি, এই অসংখ্য লোকের নিশ্বাসের ঘেঁষাঘেঁষির মাঝখানে? জানেন এটা একটা সামাজিক অপরাধ?

জানি বইকি।—মেয়েটা হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, আর সেই ঢাকা মুখ থেকেই কথা বলল, জানি গরিবের রোগ হওয়া অপরাধ, গরিবের বাঁচতে চাওয়া অপরাধ, গরিবের এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে দাবি করা অপরাধ। আগের বাড়িওলা জানতে পেরে তাড়িয়ে দিল, কোন স্যানাটোরিয়ামে ঢোকাতে চেষ্টা করা যে আমার মত সহায়-সম্বলহীন একটা মেয়ের পক্ষে কত হাস্যকর তা আপনিও জানেন। তবে কী করব বলুন? দাদাকে নিয়ে আমি কি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব? তাতেই বা কী, হয়তো রাস্তার হাওয়াও তাতে দূষিত হয়ে উঠবে, আপনাদের পথ চলার বিঘ্ন হবে।

টস টস করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মেয়েটার আঙুলের ফাঁক দিয়ে।

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে শঙ্কর আস্তে আস্তে বলল, আপনার নাম কী?

কী দরকার ?

শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমার নাম চন্দনা।

সমস্ত ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। অন্ধকার করিডোর দিয়ে নিঃশব্দে একটা ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেল, কে জানে, সাক্ষী রইল কি রইল না !

কে জানে, কী তোলা থাকল পরবর্তী দিনের জন্যে ! ও নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে দোরটা বন্ধ করে সোনার হারটা হাতে তুলে নিল শঙ্কর।

ভারী, যথেষ্ট ভারী। 'সোনা নয়' এ অপবাদ দেওয়া চলে কি ?

কিন্তু এ কী অদ্ভুত পরিস্থিতি !

কোন রহস্য-কাহিনী কি কোন সস্তা গল্পে এমন একটা ঘটনা শঙ্করই কি পড়েছে ?

ড্রয়ারটা টেনে তুলে রাখল জিনিসটা, চাবি বন্ধ করল ড্রয়ারের।

পরদিন লুকিয়ে ওটা নিয়ে বেরিয়ে গেল, এবং দূর পাড়ার একটা গহনার দোকানে গিয়ে ওজন করিয়ে নিঃসংশয় হল।

বাস্তবিকই খাঁটি সোনার জিনিস, বাস্তবিকই তেরো ভরি ওজন। নিজের কাছেই নিজের লজ্জায় মাথা কাটা যেতে বসল শঙ্করের। ছি-ছি, কী কদর্য কুৎসিত ব্যবহারই করেছে সে কাল মেয়েটার সঙ্গে ! অথচ নাকি এত বড় বাড়িটার মধ্যে শঙ্করকেই ভদ্র সভ্য আর বিশ্বাসভাজন মনে হয়েছিল চন্দনার !

বোকা ! বোকা ! অদ্ভুত রকমের সংসারজ্ঞানহীন মেয়েটা। আর অসঙ্গত রকমের ভাবপ্রবণ।

কিন্তু শঙ্কর তো তা নয়।

শঙ্কর পারে না এখুনি নগদ টাকাটা (যা নাকি চন্দনার আশার চাইতে বেশীই হয়ে যাচ্ছে) নিয়ে গিয়ে চন্দনার হাতে তুলে দিতে ! হয়তো কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হবে চন্দনা, হয়তো সেই করুণ চোখ দুটোয় ওর ফুটে উঠবে হাসির ঝিলিক একটু, তবু শঙ্কর সংসার-জ্ঞানসম্পন্ন। যেমন করে হোক চন্দনাকে একবার বাইরে বার করে এনে বেচাকেনাটা ওর সামনেই করাতে হবে। এই ওর বিবেচনা !

এনেছেন ?

দুপুরে এসে দাঁড়াল চন্দনা।

শঙ্কর কি এই আসাটা প্রত্যাশাই করছিল? নইলে এককথায় চেয়ারটিকে সরিয়ে দিয়ে বসতে বলল কেন? বলল, বসুন। কী বলছেন বলুন?

মজা করা যাক না একটু এই সরল মেয়েটাকে নিয়ে!

বলুন?

কী বলব?—মূঢ়ের মত বলল চন্দনা।

কী যেন আনার কথা বলছিলেন?

বলছি টাকাটা এনেছেন?

টাকা? কিসের টাকা?

আহা!

অদ্ভুত সুন্দর একটু হাসি ফুটে ওঠে চন্দনার মুখে।

হাসলেন মানে? হঠাৎ টাকা আনার কথা বললেন, আবার হাসছেন, এ সব কী?

জানি না, যান। বলুন না। বড় অস্থিরতা আসছে আমার, এখুনি দাদা খোঁজ করবে।

নাঃ, এত বোকা নিয়ে ঠাট্টাও চলে না।

বলল শঙ্কর, শুনুন, যতই হোক আপনার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন, ঝোঁকের মাথায় দিয়ে গেলেন, আর আমি বেচে দিলাম, এটা কি ঠিক? আর একবার বিবেচনা করুন।

অনেক দিন ধরে বিবেচনা করেছি।

বেশ, আমার সঙ্গে চলুন আপনি।

কোথায়?

সোনার দোকানে।

না না।—ব্যাকুল চাহনি ফুটে ওঠে ওর মুখে: সে আমি পারব না।

আচ্ছা মুশকিলেই ফেললেন! এমন বিপদে আমি কখনও পড়ি নি। আমাকে এত বিশ্বাসের মানে কী? কত ওজন কত দাম নিজে দেখে নেবেন না?

না না। আপনি দয়ালু, আপনার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

চিরদিন মনে থাকবে? বাজে কথা! পুরী কি রাঁচি চলে গেলেই ভুলে যাবেন।

ককৃখনো না। আপনি আমায় কী ভাবছেন বলুন তো?

আপনাকে কী ভাবছি তা আর নাই বললাম। কিন্তু ভাবছি অন্য আর-একটা কথা। দাদাকে নিয়ে চেঞ্জে যাবার সাহস তো করছেন, কিন্তু সামলাতে পারবেন?

কী করব বলুন? আমাদের যে আর-কেউ নেই।

কতদিন অসুখ করেছে আপনার দাদার?

আট-দশ মাস।

তা এতদিন, মানে আর কী, এর আগে আপনার বিয়ে দেন নি কেন? তা দিলেও তো—

দেন নি কেন?—চন্দনার মুখে ফুটে ওঠে একটা দার্শনিক হাসি।

হাসির কী হল? দেখতে আপনি এমন কিছু খারাপ নন, সুন্দরীই বলা চলে প্রায়—

আমার দাদার পকেটটা যে সুন্দর নয়। সবটাই ফাঁকা। কিন্তু থাক্ ও-প্রসঙ্গ, দয়া করে আপনি আমার ওই কাজটা সেরে রাখবেন, আসব আমি সন্ধ্যাবেলা।

চলুন না আপনার দাদাকে দেখে আসি।

ওরে সর্বনাশ!

কেন, সর্বনাশ কিসের?

দাদা এসব মোটে ভালবাসে না।

এসব? 'এসব' কথার অর্থ? কী সব?—চোখ মুখ কোঁচকায় শঙ্কর।

জানি না। বুঝলেন না বুঝি? দাদা ভালবাসে না, মেয়েদের সঙ্গে ছেলেদের বন্ধুত্ব হওয়া।

বন্ধুত্ব হওয়া মানে?—শঙ্কর সহসা রীতিমত গম্ভীর হয়ে যায়: সেটা আবার কখন হল? আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে, এমন অদ্ভুত ধারণার কারণ?

কারণ কি শুধু চোখেই দেখা যায়? আপনার কথা জানি না, আমার কথাই বলছি—। গম্ভীর আর গাঢ় স্বরে কথা শেষ করে চন্দনা: বিপদে যে সহায়, তাকেই আমি 'বন্ধু' বলি।

ধীরে ধীরে চলে যায় ও। আর শঙ্করের? নিজের পিঠে নিজে শঙ্কর-মাছের চাবুক মারতে ইচ্ছে হয় তার। ছি-ছি! কেন বারে বারে নিজের নীচতা প্রকাশ করে বসছে সে নির্বোধ ভাবপ্রবণ একটা মেয়ের কাছে?

ও যখন মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল, ঠিক একটা স্কুলের মেয়ের মত দেখাচ্ছিল।

কত বয়েস ওর? কে জানে! মেয়েদের বয়েস বোঝা শঙ্করের কর্ম নয়

কী মশাই শঙ্করবাবু, অমন তচনচ করে কী খুঁজছেন? কিছু হারালেন নাকি?—সন্ধ্যাবেলা কাঁধে তোয়ালে ফেলে বাথরুমে যাবার পথে বিনয়বাবু উঁকি মারলেন। সত্যিই তখন সারা ঘর তচনচ করে ফেলে উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছু একটা খুঁজছে শঙ্কর। বিনয়বাবুর কথায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাত্র, কথা বলল না।

কী হারালেন?

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, এমন কিছু নয়। মানে আর কী—

মানে আর কী, ছোট্ট একটি স্ক্রু কিংবা অমনি কিছু, তাই না?—হেসে ওঠেন বিনয়বাবু: আপনার তো ওই সর্বস্ব।

বিনয়ের হাসিটা হঠাৎ কেমন যেন বিশ্রী লাগে শঙ্করের। অমন দাঁত বার করে হাসছে কেন ও? বিরক্ত স্বর না চেপে বলে, তাতে হাসবার কী হল?

কী মুশকিল, চটছেন কেন? যেভাবে পাগলের মত চেহারা করে সব ওটকাচ্ছেন, দেখে মনে হতে পারে প্রেমপত্তর-টত্তরই বুঝি হারিয়েছে, কিন্তু ওসবের বালাই তো আপনার নেই।

নেই তো কী? আপনি অত হাসছেন কেন?—চটে উঠে বলে শঙ্কর।

হুঁ-হুঁ ভায়া, আমার গিন্নীটি তো তা হলে ঠিকই ধরেছে। অকারণ উষ্মা এটা যে পূর্বরাগের একটা লক্ষণ। কিন্তু সাবধান মশাই, মেয়েটার দাদা একটি টি. বি.-রোগী, বুঝলেন?

আপনি বলতে চান কী?—ধমকে ওঠে শঙ্কর।

বলতে কিছুই চাই না ভায়া, শুধু বলছি একটু দেখে-শুনে প্রেমে পড়বেন। আমি না দেখি আমার গিন্নীটির তো কিছু চোখ এড়ায় না। ওদিকের ওই ঘরের মেয়েটার আপনার এদিকের ঘুরঘুরুনি উনি ঠিকই দেখেছেন। পরশু তো রাতদুপুরে—

আপনি যাবেন এ ঘর থেকে?—গম্ভীরভাবে বলে শঙ্কর।

ও, এতদূর? আচ্ছা।—বলে গমগম করে বেরিয়ে যান বিনয়বাবু। আর

সঙ্গে সঙ্গে যেন হাল ছেড়ে বসে পড়ে শঙ্কর। কী করবে? আর কোথায় খুঁজবে?

অথচ স্পষ্ট মনে রয়েছে, কাল স্যাকরাবাড়ি থেকে এসে হারছড়াটা ড্রয়ারেই রেখে দিয়েছিল সে তালা দিয়ে। তালার চাবি? সে তো তার পকেটেই ছিল।

তবে? কোথায় গেল অপরের গচ্ছিত সোনা?

সারারাত ধরে খুঁজলেই কি পাওয়া যাবে?

পরদিন চন্দনা এল মুখে একমুখ হাসি নিয়ে।

সাজসজ্জাতেও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য।

সব ব্যবস্থা করে ফেললাম। পুরীতে একটা বাড়ি পাওয়া গেছে অমনি। দাদার এক বন্ধুর মামার। এখন শুধু বেরিয়ে পড়া।

গুম হয়ে বসে ছিল শঙ্কর, রক্তচক্ষে শুধু একবার তাকাল। চন্দনা থতমত খেয়ে বলল, আপনার কি কিছু অসুখ করেছে?

হ্যাঁ, করেছে।—হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্কর কঠোর মুখে বলে ওঠে, অত লাফাচ্ছেন কেন? টাকাটা পেতে দেরি হবে।

দেরি হবে!—স্খলিত স্বরে বলে চন্দনা।

হ্যাঁ, দেরি হবে, এই হচ্ছে কথা। তিন দিনের আগে নয়।

কিন্তু শঙ্করবাবু, আমি যে পরশুই রওনা দেব ভাবছি।

পরশুই!—শঙ্কর এক মিনিট ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভেবে বলে, ঠিক আছে, তাই পাবেন।

আপনি এমন ভয় পাইয়ে দেন!—চন্দনার চোখে অভিমান।

আপনি যান। এ-ঘরে আপনার আসবার দরকার নেই।

দরকার নেই!—ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায় চন্দনা: আচ্ছা।

চলে যায় সে।

আর, আরও একবার নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে শঙ্করের। কী করছে সে? অনবরত কেন এমন করছে? চন্দনা যেই চলে যায় মমতায় মনটা ভরে ওঠে, কিন্তু দেখলেই সব গুলিয়ে যায় কেন? কেন আঘাত দেবার ইচ্ছে করে?

তবু ভাগ্যিস বলে বসে নি, 'আপনার জিনিসটা চুরি গেছে'!

আর একবার ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে চন্দনা, দুই চোখে তার অগাধ হতাশা, ঠোঁটের কাঁপনে মানসিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট: টাকাটা কি পাব না?

পাবেন না! পাবেন না মানে?—হঠাৎ খুব হেসে ওঠে শঙ্কর, সত্যিই বুঝি ভেবে বসলেন, আমি আপনার জিনিস মেরে দিয়েছি? ঠাট্টাও বোঝেন না? ব্যাঙ্কের কি অসুবিধে পড়েছে, কাল দেবে টাকাটা।

আচ্ছা।—বলে শান্তভাবে চলে যায় চন্দনা।

আর শঙ্কর বসে বসে ভাবতে থাকে, কোথা থেকে এক দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যাবে হাজার খানেক টাকা? ঘড়ি আংটি বোতাম সব বেচলেও বা কতই হবে? কে ধার দেবে শঙ্করকে? কাবুলীওয়ালা?

কিন্তু হারটা কোথায় গেল? গেল কী করে?

নিতান্ত সাধারণ অবস্থার একজন লোকের পক্ষে হঠাৎ এক দিনের মধ্যে হাজার টাকা সংগ্রহ করা সহজ নয়, তবু সেই অসাধ্য সাধনও করল শঙ্কর।

বিনিময়ে?

বিনিময়ে একটি অপূর্ব কৃতজ্ঞতামণ্ডিত চাহনি।

মুহূর্তের জন্য বুঝি বিচলিত হয়ে উঠতে চায় শঙ্করের মন। ওরই নিজের জিনিস, শুধু সামান্য একটু সাহায্য। এতেই কত কৃতজ্ঞতা! শঙ্কর কি বলবে, আপনাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব আমি?

সত্যি, এটুকু তো সামান্য মানবিকতা মাত্র।

তবু বলতে ইতস্তত করল। বিনয়বাবুর সেই হাসিটা ছুঁচের মত ফুটে আছে।

আচ্ছা, হারটা হারানোর সঙ্গে বিনয়বাবুর কোন যোগ নেই তো? বিদ্যুৎ-শিহরণের মত মনের মধ্যে খেলে যায় কথাটা।

টাকাটা হাতে নিয়ে চন্দনা শান্ত হেসে বলে, অমন অন্যমনা হয়ে গেলেন যে?

না, এমনি। কোন্ গাড়িতে যাবেন?

পুরী এক্সপ্রেসে। আমি যাই।—অনুমতির অপেক্ষা না নিয়েই দ্রুতপদে চলে গেল চন্দনা।

শঙ্কর তখন সেই তীক্ষ্ণ সন্দেহের শরাঘাতে কাবু।

হ্যাঁ, নিশ্চয়।

নিশ্চয়ই বিনয়বাবু।

তাই অমন ধূর্ত শৃগালের মত হাসি। আচ্ছা, দেখে নেবে ওকে শঙ্কর পুলিসে দিয়ে ছাড়বে।

কিন্তু পুলিসে দেওয়ার ব্যবস্থাটা কী? শঙ্করের তো কিছুই জানা নেই।

আজ আর কাজে বেরয় নি শঙ্কর।

সকাল থেকে প্রত্যাশা করে বসে আছে। অথচ সমস্ত শূন্যতা। আশ্চর্য, একবারও দেখামাত্র না করে চলে যাবে চন্দনা?

মেয়েরা কি তা হলে এমনিই? কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে ওরা আর সেই উদ্ধারযন্ত্রটার দিকে ফিরেও তাকায় না! কিন্তু তাই কি? এত বড় বাড়িটায় কোথায় কী হচ্ছে কে জানে! হয়তো ওর দাদার অসুস্থতা বেড়েছে, হয়তো দাদা আগলে রেখেছে, হয়তো বা একা ছেলেমানুষ সব রকম ব্যবস্থা নিয়ে বিব্রত।

তবু?

দিন বয়ে যায়, তবু আসে না লগ্ন।

বেজে ওঠে না দরজার কাছে মৃদু পদধ্বনি।

পড়ন্ত বেলায় হঠাৎ একটা কাজ নিয়ে বসে শঙ্কর নিবিষ্ট হবার চেষ্টা করে।

সেদিনের সেই খুলে-ফেলা টাইমপীসটা। আজ অবধি তাতে আর হাত পড়ে নি।

ছোট ছোট স্ক্রুগুলো সব আছে তো?

সেদিন যা করে লাফিয়ে উঠে বাঁচিয়েছিল সব।

কিন্তু বিনয়বাবুকে কী করে কায়দা করা যাবে? ঘড়ি আংটি বোতাম বেচে মোটা সুদে ধার নিয়ে আজ না হয় টাকাটা যোগাড় হল, কিন্তু নীরবে এই হারিয়ে যাওয়াটা পরিপাক করবে নাকি?

আচ্ছা, পুলিসের কাছে কী বলবে?

জিনিসটার সম্পূর্ণ বিবরণই তো দিতে পারবে না। কিন্তু বিনয়বাবু এমন?

তা এমন আর কে নয়! চন্দনা এল না একবারের জন্যে দেখা করতে!

এই যে শঙ্করবাবু।—বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর বেজে উঠল দরজার কাছে: গরিবের কথা বাসী হলে মিষ্টি লাগে কি না! পরশু দুটো ঠাট্টা করেছিলাম তাই তেড়ে মারতে এলেন। দেখুন তো এখন।

আপনার কথার মানে বুঝতে আমি অক্ষম।—মুখ না তুলেই বলে শঙ্কর।

হুঁ, তা অক্ষম হবেন বইকি। বেশ একটু ভেস্তে গেছেন মনে হচ্ছে। এখন দেখুন তো শিক্লি কেটে পাখি খাঁচা থেকে পালাচ্ছিল, পুলিস এসে এই ক্যাঁক।

কুৎসিত একটা ভঙ্গি করে আবার তাড়াতাড়ি চলে যান বিনয়বাবু।

শঙ্করও বোধ করি অজ্ঞাতসারেই ওঁর পিছন পিছন বেরিয়ে যায় হাতের জিনিসপত্র ছড়িয়ে রেখে।

টি. বি.-রুগী সেজেছিলেন ইনি, বুঝলেন মশাই, রুগী সেজে এর মধ্যে এসে আত্মগোপন করে বসে ছিলেন।—জোয়ান একটা লোককে ধরে নাড়া দিয়ে গর্জন করে ওঠেন পুলিস অফিসার: কুঠে সেজেও কেউ পার পায় না আমাদের কাছে। সমবেত জনতার দিকে একটি গর্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন ভদ্রলোক: আশ্চর্য! এতদিন দেখেছেন আপনারা, একদিনের জন্যে এতটুকু সন্দেহ হল না আপনাদের? এই দুটি ভাই বোন, মশাই, মহা-ধুরন্ধর! পুলিসকে কি এরা কম হয়রান করিয়েছে! রুগী সাজা এদের এক কৌশল। কখনও বোনটি রুগী সাজেন, দাদা জোচ্চুরি করে বেড়ান; কখনও দাদা রুগী সাজেন, বোনটি ফন্দী আঁটেন।

ভাই বোন না আর-কিছু তাই বা কে জানে!—জনতা থেকে উচ্চারিত হয় কথাটা।

না না, সে সব রেকর্ড আছে পুলিসের ঘরে। ভাই বোন ঠিকই। বোনটি আবার দাদার চাইতে আরও ধুরন্ধর। দশ বছর বয়েস থেকে দাদার ডান হাত হয়ে জোচ্চুরি ব্যবসা চালাচ্ছেন, এখন দাদাকে হাতে ধরে শেখান। ছলনার কি শেষ আছে? তীর্থে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়ে একটি বুড়ী মহিলার কাছ থেকে ওই হারটি হাতিয়ে এনে ডুব। সেই থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। ফসকাচ্ছিল—জিনিসপত্র সব বুক্ হয়ে গেছে, টিকিট কাটা, পালাচ্ছিল ম্যাড্রাসে। আরে বাবা, ক্যালকাটা পুলিসের হাত ফসকানো অত সোজা নয়।…চলুন তা হলে—কী বলব আপনাকে—কমলা রায়? বাসন্তী ভৌমিক?

শিখা তালুকদার? না, চন্দনা চ্যাটার্জি? যাক, নামেতে কী করে? গোলাপে যে নামে ডাক সৌরভ বিতরে।

রীতিমত রসিক ভদ্রলোক। এবং তাঁর সেই গুণপনার পরিচয় দিতেও উৎসুক।

এই, হঠ যাও।—সামনের লোকটাকে অকারণ খিঁচিয়ে সোনার হার ছড়াটা পাঁচজনের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে অবহেলাভরে অফিসার মচ মচ করে এগিয়ে যান। মানে, পিছনে দুটো নর-নারীকে প্রায় পিটোতে পিটোতে নামিয়ে নিয়ে যায় দুটো কনেস্টবল।

তবু—তবু সেই নারীর পদক্ষেপে যেন বিজয়িনীর ভঙ্গী।

চললাম তা হলে শঙ্করবাবু।

চমকে ওঠে শঙ্কর। চমকে ওঠেন পুলিস অফিসারও।

আপনাদের মধ্যে পরিচয় আছে দেখছি যে—

আপনার দেখাটা ভুল নয়। থাকাটায় আশ্চর্যের কী আছে, প্রতিবেশী তো।

হুঁ। আপনার রুম নম্বর?

থার্টিফাইভ।

ধন্যবাদ।

কোথায় যেন একটা চোখে চোখে ইশারা হয়ে গেল। অর্থাৎ শঙ্করকে বাঘে ছুঁল।

কিন্তু শঙ্করের যেন এত বড় ভয়েও ভয় নেই, আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসে ফের কাজটা নিয়ে বসে। দূর, ভাল লাগছে না। কী হবে সেরে? জীবনভোর শুধু কতকগুলো ভাঙা যন্ত্রই মেরামত করে এল সে। আচ্ছা, চেষ্টা করলে মেরামত করে তুলতে পারে না একটা দোমড়ানো-মোচড়ানো ভাঙা মানুষ? কচি বেলাতেই যাতে ঘুণ ধরেছে।

জামিন দিতে কত টাকা লাগে?

হাজার?

আরও একবার যোগাড় করা যায় না?